অ-আ-ক-খুনের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

অ-আ-ক-খুনের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

ডি.এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম পেকাশ : আশ্বিন ১৩৬৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণি
কলিকাতা-[illegible]

॥ কৈফিয়ৎ ॥

'মাসতুতো ভাই'-এর সম্পর্কটা যে 'চোরে চোরে' নয়, সে-কথা নামকরণের মাধ্যম ছাড়াও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করে যেতে চাই : আগাথা ক্রিস্টির অতিবিখ্যাত গোয়েন্দা গল্প 'এ.বি.সি. মার্ডার্স' যাঁরা ইংরাজীতে পড়তে পারবেন না তাঁদের কথা মনে করেই এ গল্পটি লেখা গেছে। ভৌগোলিক ও সামাজিক পটভূমি বদল করায় আমাকে সবকিছুই নতুন করে সাজাতে হয়েছে। তাই ছায়াবলম্বন নয়, এটি পেনাম্রাবলম্বন।

এটি 'কাঁটা সিরিজ'-এর সপ্তম কাহিনী। প্যারী ম্যাসনের ছায়া দিয়ে গড়া পি. কে. বাসুকে নিয়ে ইতিপূর্বে পুরো এক 'ওভার' বল দিয়েছি : সোনার কাঁটা, মাছের কাঁটা, পথের কাঁটা, ঘড়ির কাঁটা, কুলের কাঁটা, ও উলের কাঁটা। তার আগে 'নাগচম্পা'-র 'ট্রায়াল বল'-এই অবশ্য পি. কে. বাসুর প্রথম আবির্ভাব। তখন তিনি ছিলেন বিপত্নীক। কিন্তু ঐ কাহিনীর চিত্ররূপ 'যদি জানতেম' দেখতে গিয়ে জানা গেল—না, পি. কে. বাসু আদৌ বিপত্নীক নন, তাঁর স্ত্রী জীবিতা এবং পঙ্গু। সে ছায়াছবিতে পি. কে. বাসুর চরিত্রে ছিলেন উত্তমকুমার। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরদা। তথ্যটা পাঠকের মনে এমন দৃঢ়মূল হয়ে গেল যে, আমাকে 'কাঁটা-সিরিজে' মেনে নিতে হয়েছে বাসু-সাহেবের স্ত্রী বর্তমান।

দীর্ঘ পাঁচ-সাত বছর আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে মেতেছিলাম। স্বভাবগত পল্লবগ্রাহিতায় শিল্প ও বিজ্ঞানের নানান ডাল-পালায় নর্তন-কুর্দনে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর একদিন এক অজ্ঞাত পাঠকের পত্রে থমকে গেলাম। ভদ্রলোক লিখেছেন : পি. কে. বাসুর মৃত্যু-সংবাদটা কাগজে দেখিনি কিন্তু! তিনি বেঁচে আছেন তো?

চিঠিখানি পড়তে পড়তে মনে হল মগজের এক কোণায় যেন চিন্‌চিনে ব্যথা! যেন একটা কাঁটা খিঁচ্ খিঁচ্ করছে। যন্ত্রণাটা একা একা ভোগ করি কেন? আপনাদেরও কিছুটা খোঁচানো যাক্।

নারায়ণ সান্যাল

—আহ্! ওটা কী করছ! ওটা সল্ট! এই নাও—

মুনের পাত্রটা সরিয়ে সুগার-পটটা রাণী দেবী ঠেলে দিলেন স্বামীর দিকে।

—ও, আয়াম সরি!—এবার চিনির পাত্র থেকে এক চামচ চিনি তুলে নিয়ে নিজের চায়ের কাপে মিশিয়ে নিলেন বাসুসাহেব। সুজাতা কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে দেখতে থাকে তার বাসুমামার চায়ে চিনি মেশানোর কায়দাটা। বাসুসাহেব আদৌ ভুলো মানুষ নন।

রাণী বলেন, তোমার আজ কী হয়েছে বল তো? সকাল থেকে ভীষণ অন্যমনস্ক দেখছি!

বাসু জবাব দিলেন না। সুনিপুণ ভাবে তিনি চায়ের কাপে চিনি মেশাতে থাকেন। 'সুনিপুণভাবে' অর্থে এক বিন্দু চা যেন ছল্‌কে প্লেটে না পড়ে, কাপের কাঁধায় চামচের আঘাত লেগে যেন ঠুন্ ঠুন্ শব্দ না ওঠে। এ সব অসৌজন্য নাকি টেবিল ম্যানার্সের বিরুদ্ধে। এ জাতীয় আচরণ ওঁর মজ্জায় মজ্জায় মেশানো—সচেতনভাবে করেন না। এ কিছু খানদানী টী-পার্টি নয়। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে প্রাতরাশের টেবিলে বসেছেন ওঁরা চারজন—বাসুসাহেব, রাণী দেবী, কৌশিক আর সুজাতা। বিশে, মানে ওঁর ছোকরা চাকর, রান্নাঘর থেকে খান-কয় গরম টোস্ট এনে রেখে গেল খাবার টেবিলে। রাণী দেবী কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, কী ডিটেক্‌টিভ-সাহেব? আমার ডিডাক্‌শান ঠিক? তোমাদের আবার কোন কেস্ এসেছে নিশ্চয়? খুনটা হল কে?

কৌশিক আর সুজাতা থাকে ঐ একই বাড়িতে। ভাড়াটেও নয়, পেয়িং-গেস্টও নয়, ব্যবসায়ের পার্টনার। বাসুসাহেব প্রখ্যাত ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, আর কৌশিক-সুজাতা যৌথভাবে খুলেছে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা-অফিস: 'সুকৌশলী'। একতলার একদিকে ব্যারিস্টার সাহেবের অফিস, অপরদিকে সুকৌশলীর; মাঝখানে দুই অফিসের যৌথ রিসেপ্‌শান কাউন্টার। তাতে বসেন মিসেস্ রাণী বাসু—বাসুসাহেবের পঙ্গু সহধর্মিণী। দ্বিতলটা কৌশিক-সুজাতার রেসিডেন্স। বাসুসাহেব সস্ত্রীক একতলাতেই থাকেন, কারণ রাণীর পক্ষে হুইল্‌ড্-চেয়ারে দ্বিতলে ওঠা সম্ভবপর নয়।

রাণীর প্রশ্নে কৌশিক টোস্টের কর্তিত অংশটা গলাধঃকরণ করে বলে, আমি যদ্দূর খবর রাখি—এ হপ্তায় কোন মক্কেল বাসুমামুর চৌকাঠ পার হয়নি!

বাসু বললেন, ভুল হল তোমার।

কৌশিক প্রশ্ন করে, এসেছে ? আমার নজর এড়িয়ে কোন মক্কেল ?

—তা বলছি না। বলছি, তোমার 'স্টেটমেণ্ট'টা ভুল।

—কী আবার ভুল হল ? আমি তো শুধু বললাম : 'এ হপ্তায় কোন মক্কেল বাসুমামুর চৌকাঠ পার হয়নি !'

বাসু জোড়া-পোচের প্লেটটা টেনে নিয়ে বলেন, সুজাতা ! তুমি বলতে পার ? তোমার কর্তার ঐ স্টেটমেণ্টে কোন ভুল আছে কি না ?

কৌশিক তার ধর্মপত্নীর দিকে অসহায়ভাবে তাকায়।

—পারি মামু ! 'সপ্তাহ' বলতে আমরা সচরাচর বুঝি 'সোম টু রবি'। সপ্তাহ শুরু হয় 'সোম' থেকে। আজই সোমবার। ও 'মীন' করছে গত সপ্তাহ, বলছে 'এ সপ্তাহ'।

—কারেক্ট ! আর কোন ভুল ?

—হ্যাঁ। আপনার চেম্বারের প্রবেশ-পথে কোনও চৌকাঠের চতুর্থ কাঠ নেই। ইন-ফ্যাক্ট, এ বাড়ির কোন ঘরের দরজাতেই তেমন কোন কাঠ নেই। তিন কাঠের ফ্রেম আছে প্রতিটি দরজায়। সুতরাং 'চৌকাঠ' শব্দটা যদি কেউ উচ্চারণ করে তবে বুঝতে হবে—হয় সে বাংলায় কাঁচা, অথবা 'সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং'।

রাণীদেবী উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন। বলেন, না, না, কৌশিকের মাতৃভাষা বাংলা, বেচারি বোধহয় সিবিল-এঞ্জিনিয়ারিং-এই একটু কাঁচা। তোমার মতো পাকা এঞ্জিনিয়ার নয় !

কৌশিক শিবপুরের বি. ই.। সিবিল-এরই। বেচারি নিঃশব্দে দ্বিতীয় টোস্টে মাখন মাখাতে থাকে। বাসু বলেন, ও যা বলতে চায়, গুছিয়ে বলতে পারল না, সেই স্টেটমেণ্টটা কিন্তু ঠিক। অর্থাৎ 'গত সপ্তাহে আমার চেম্বারে কোন মক্কেল আসেনি।' কিন্তু রাণুর অবজারভেশানটাকেও উড়িয়ে দিতে পারছি না—ওর ডিডাক্‌শনটাও ঠিক—'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' ! লবণে শর্করাভ্রম যখন হয়েছে, তখন আমার চিত্তচাঞ্চল্যের একটা হেতু আছে—পত্রাৎ !

—অর্থাৎ ?

—আজকের ডাকে একটা রহস্যময় চিঠি পেয়েছি। খামের চিঠি। দাঁড়াও দেখাই।

এটি নিশ্চয় শনিবারের চিঠি। এসেছে বিকালের ডাকে। কিন্তু ওঁরা সপ্তাহান্তে বেড়াতে গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। ফিরেছেন রবিবার রাত্রে। বাসুসাহেবের ঘুম ভাঙে কাক-ডাকা ভোরে। বাড়ির আর সকলের নিদ্রাভঙ্গের আগেই তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এবং এক চক্কর প্রাতঃভ্রমণ সমাপনান্তে তাঁর চেম্বারে এসে বসেন। গত দিনের বিকালের ডাকে আসা চিঠিগুলি পড়েন এবং

তার মাথায় এ বি. সি. দাগ দিতে দিতেই খাবার টেবিলে ডাক পড়ে। প্রাতরাশ শেষ হলে রাণীদেবী এসে চিঠিগুলি শর্টিং করেন। কোন্ চিঠি যাবে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে, কোন্‌টা সরিয়ে রাখতে হবে সময়মত জবাব দিতে, আর কোন্‌টা জরুরী। যে কোন কারণেই হোক, আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। ডাকের একখানি চিঠি আশ্রয় পেয়েছে বাসুসাহেবের ড্রেসিং-গাউনের পকেটে। খামটা বার করে উনি সন্তর্পণে টেবিলের উপর রেখে বললেন, তোমরা একে একে দেখ। তারপর আলোচনা হবে। · না, না, অত সাবধানতার দরকার নেই। খামে কোনও ফিঙ্গার-প্রিণ্ট নেই।

কৌশিক আর সুজাতার চোখাচোখি হল। কৌশিক স্ত্রীকে বললে, আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? তুমিই আগে দেখ, আমি আবার কী বলতে কী বলব!

সুজাতা মুখ টিপে হেসে বলে, বাঃ! তা কি হয়? তুমি হলে গিয়ে 'সুকৌশলী'র সিনিয়ার পার্টনার!

রাণীদেবী হেসে বলেন, তোমাদের ঐ অজাযুদ্ধ-ঋষিশ্রাদ্ধ শেষ হওয়া তক্ আমার বাপু ধৈর্য থাকবে না। আমিই দেখি প্রথম—

খামটা লম্বাটে। পোস্ট-অফিসে যে রকম খাম কিনতে পাওয়া যায়, তা নয়। বেশ ভালো খাম। দামী, মোটা কাগজ। খামের উপর টিকিট সাঁটা। নাম-ঠিকানা টাইপ করা—মায় কোণায় 'Q.M.S.' ছাপটাও। ভিতরের কাগজখানা কিন্তু খেলো। তার এক পিঠে কিছু অঙ্ক কষা। সম্ভবত বীজগণিতের। মনে হয় কোন বড় কাগজ থেকে লম্বালম্বি ভাবে ছেঁড়া। তাই অঙ্কটার সবটা বোঝা যাচ্ছে না। অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজিতে টাইপ করা একখানি চিঠি। চিঠির উপরে একটি কুমীরের ছোট্ট ছবি। রঙিন ছবি। কোন ইংরাজি ছবির বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ছবির নিচে টাইপ করা আছে ইংরাজী ব্লক-ক্যাপিটালে—

'A'—FOR ALLIGATORAIH NAMAH!

তার নিচে ইংরাজি চিঠিখানির আক্ষরিক অনুবাদটা এই রকম:

"শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট্-লয়েষু,

"মহাশয়,

"শুনিয়াছি, আপনি কী একটি 'আন্‌-ব্রোকেন-রেকর্ডে'র অধিকারী।

"আপনাকে ষড়বিংশতিটি সুযোগ দিতেছি। হয়তো X, Q অথবা Z-এ পৌছিয়া আমি কিছু পোয়েটিক-লাইসেন্স গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব। নিজগুণে ক্ষমা করিবেন!

"ষড়বিংশতিবারই গাড্ডু মারিলে কেদ্দানি প্রদর্শন হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন কি?

"রেডি-স্টেডি-গো: 'A' ফর ASANSOL। তাং—এ মাসের উনিশে! ইতি একান্ত গুণমুগ্ধ

A-B-C"

বার-বার তিনবার পাঠ করে রাণী দেবী নিঃশব্দে পত্রখানি সুজাতার হাতে দিলেন। সুজাতাও খুঁটিয়ে দেখল চিঠিখানা। কোন মন্তব্য প্রকাশ করল না। হস্তান্তরিত করল কৌশিককে। কৌশিক কিন্তু চিঠিখানা পড়ে নীরব থাকতে পারল না। বললে, বদ্ধ উন্মাদ!

রাণী বললেন, কিন্তু বদ্ধ উন্মাদের ইংরাজি জ্ঞানটা টনটনে। একটাও বানান ভুল করেনি।

—এবং টাইপিং-এ পাকা হাত। ছাপার ভুলও নেই।—যোগ করল সুজাতা।

—কিন্তু ঐ কথাটার মানে কি হল? ঐ 'ALLIGATORAIH NAMAH'?—জানতে চান রাণী।

বাসু বলেন, Alligator শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন। লোকটা সংস্কৃত ভালো জানে। এবং বিসর্গ চিহ্ন যে রোমান হরফে 'H' দিয়ে বোঝাতে হয় সেটাও। শুধু শেয়ানা-পাগল নয়, লোকটা শিক্ষিত। সম্ভবত উচ্চশিক্ষিত।

কৌশিক বলে, মানছি! শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, মহোমহাপাধ্যায়। কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ!

বাসুসাহেব চুরট ধরাচ্ছিলেন। নিপুণভাবে সেটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, সুজাতা?

—উঁ?

—এবার কৌশিকের স্টেটমেণ্টে কোনো ভুল নজরে পড়েছে তোমার?

—পড়েছে বাসুমামু। দুটো ভুল। একটা ভাষার, একটা ডিডাকশনের। কথাটা 'মহোমহাপাপধ্যায়' নয়, 'মহামহোপাধ্যায়', আর বদ্ধ উন্মাদ মানে raving lunatic! সে চিঠি টাইপ করতে কিংবা খামের উপর ঠিকানা লিখতে পারে না, উপযুক্ত টিকিট সাঁটতে জানে না, 'Q.M.S' শব্দের অর্থ বোঝে না।

—কারেক্ট! ফুল মার্কস!

কৌশিক উঠে দাঁড়ায়। বলে, অনেক কাজ বাকি আছে। উন্মাদের প্রলাপ—

—সুজাতা ?

—হ্যাঁ মামু। আমি লক্ষ্য করেছি। এবারও ওর ভুল হয়েছে। 'ট্রান্স্‌ফার্ড এপিথেট'। নিজের বাকপ্রয়োগের আর বিশ্লেষণের ভ্রান্তিকে সে মনে করছে অপরের পাগলামি—

রাণীদেবী কৌশিকের পাঞ্জাবির হাতটা খপ্‌ করে চেপে ধরেন। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, 'লেগপুলিং' থামাও দেখি তোমরা। কৌশিক বলতে চায়, এটা পাগলের কাণ্ড। হতে পারে। 'লোকটা বদ্ধ উন্মাদ' বলেছে সে—এটাও 'পোয়েটিক লাইসেন্স'। একটু অতিশয়োক্তি। আমারও মনে হয়, চিঠিখানা যে লিখেছে সে একটু—কী বলব ? 'এক্‌সেন্ট্রিক', আধপাগলা ! এরকম প্র্যাকৃটিক্যাল জোক করা তার উচিত হয়নি। সে ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছে···আই মীন, সে তোমাকে একটা চ্যালেঞ্জ থ্রো করেছে ! ইঙ্গিত করেছে, উনিশ তারিখে আসানসোলে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে, যার কিনারা তুমি করতে পারবে না। খুব সম্ভবত এটা একটা অমূলক হুমকি। তোমার রাত্রের নিদ্রাহরণই তার উদ্দেশ্য।

—কেন ? আমার নিদ্রাহবণে তার স্বার্থ ?

—যে কোন কারণেই হোক সে তোমার উপর খাপ্পা। চ্যাঙড়া ছেলে হলে বলতে হবে ওদের সরস্বতী পুজোয় তুমি চাঁদা দাওনি, তাই একটা হুমকি দিয়ে তোমার রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিচ্ছে।

—সংস্কৃত বা ইংরাজিতে যার এ রকম দখল সে পাডায় পাড়ায় মা সরস্বতীর নামে চাঁদা চেয়ে বেডাবে ?

—ওটা একটা কথার কথা। 'গাড্ডু' এবং 'কেদ্দানি' শব্দ প্রয়োগে ওটা আমার মনে হয়েছে। হয়তো তোমার কল্যাণে বেচারি বেশ কিছুদিন ঘানি ঘুরিয়েছে। বেরিয়ে এসে এ ভাবেই শোধ নিচ্ছে।

বাসুসাহেব সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, আর তোমার মত ?

—আমি মামিমার সঙ্গে একমত : প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক !

—আর কৌশিক ?

কৌশিক ইতিমধ্যে আবার বসে পড়েছে। বললে, আমার বিশ্বাস সুজাতার স্টেটমেণ্টটা ভুল। সে যা 'মীন' করতে চায়, তার উল্টো কথা বলছে। ও বলতে চায় 'ইম্‌-প্র্যাকৃটিক্যাল জোক'। পাগলটা ইঙ্গিতে বলেছে, আপনাকে ছাব্বিশটা সুযোগ দেবে ! এ টু জেড। শুরু হচ্ছে 'এ ফর আসানসোল' দিয়ে। হয়তো শেষ হবে Zaire বা Zambia দিয়ে। সেটা অসম্ভব ! ইম্‌-প্র্যাকটিক্যাল।

বাসু বলেন, এ ক্ষেত্রে কী আমার কর্তব্য ?

কৌশিক বলে, চিঠিখানা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া। ওটার কথা ভুলে থাকা। এবং রাত্রে শোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলা।

—এটাই তোমাদের সম্মিলিত অভিমত?

রাণী বলেন, তুমি কি করতে চাও?

—কৌশিক! তুমি এই চিঠি আর খামের খান-তিনেক Xerox কপি করে নিয়ে এস। আমি ততক্ষণ ডি. আই. জি. সি. আই. ডি.-কে একটা ফোন করে ব্যাপারটা জানাই।

সুজাতা বলে, আপনি বিশ্বাস করেন—উনিশ তারিখে আসানসোলে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে?

—পয়েন্ট-জিরো-ওয়ান পার্সেন্ট চান্স আছে বৈকি। আজ রাত্রে আমাকে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হবে না, কিন্তু তোমাদের কথামতো চিঠিখানা যদি ছিঁড়ে ফেলি আর বিশ তারিখের খবরের কাগজে যদি দেখি, আসানসোলে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে, তাহলে বিশ তারিখে রাত্রে একমুঠো স্লিপিং ট্যাবলেট খেলেও আমার ঘুম হবে না।

রাণী সায় দেন, তা ঠিক। এমনও হতে পারে—ঝড়ে কাক মরবে আর ফকিরের কেরামতি বাড়বে। অর্থাৎ নিতান্ত দৈবক্রমে আসানসোলে একটা খুন-জখম বা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হবে—যার সঙ্গে ঐ পত্রলেখকের কোন সম্পর্কই নেই, অথচ আমরা নিজেদের দায়ী করব।

কৌশিক বললে, সে-কথা ঠিক। দিন খামটা, আমি জেরক্স করিয়ে আনি। হোক পাগলামি, তবু 'আঠারো ঘা' বানানোর দুর্লভ সুযোগ থেকে কেন নিজেদের বঞ্চিত করি?

—আঠারো ঘা মানে?—সুজাতা জানতে চায়।

—'বাঘে ছুঁলে' যা হয়। এটাও 'ট্রান্সফার্ড এপিথেট'! 'বাঘ' অর্থে 'পুলিস'।

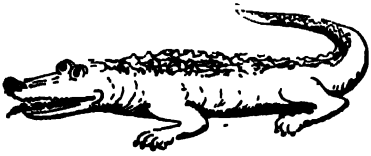

রাণীদেবী হাসতে হাসতে বলেন, তা ঠিক। এক নম্বর 'ঘা'টা নিয়ে অত চিন্তা করছি না। বহ্বারম্ভে শুরু হলেও সেটা লঘু-ক্রিয়া; কিন্তু দু-নম্বর ঘা হল কৌশিকের জেরক্স করতে দৌড়নো। তিন নম্বর এখনি পেট্রল পুড়িয়ে থানায় যাওয়া, চার নম্বর···

বাসু বলেন, তবু তো তোমরা আঠারোয় থামবে। আমাকে তো ছাব্বিশ পর্যন্ত ছুটতে হবে!

ডি.আই.জি., সি. আই.ডি. কাগজখানা দেখে বললেন, আপনি চিন্তা করবেন

না বাসুসাহেব। এ জাতীয় উড়ো চিঠি আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে পাই। লোকটা যে কোন কারণেই হোক আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত। না হলে 'আনব্রোকন রেকর্ড' কথাটা উল্লেখ করত না। এ পর্যন্ত কোন অপরাধীই যে আপনার হাত এড়িয়ে নিষ্কৃতি পায়নি—এ খবরটুকু তার জানা। হয়তো আদালত এলাকার লোক। আপনার কাছে বে-ইজ্জত হয়েছে। তা যদি হয় আমি খুশি হব। কারণ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে লোকটা ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডের। সে ক্ষেত্রে একটু ভাবনার কথা—

—কী ধরনের ভাবনার কথা ?

—ধরুন, লোকটা অপরাধ জগতের। আপনি তো জানেনই যে ওদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ রেশারেশি আছে। এমন হতে পারে লোকটা ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছে যে, ওর বিপক্ষ দলের কেউ কেউ উনিশে একটা রাহাজানির পরিকল্পনা করেছে আসানসোলে। খবরটা সে সরাসরি পুলিসকে জানাতে চায় না। পাগল সেজে আপনাকে জানালো। কারণ তার বিশ্বাস—আপনি সেটা আমাদের জানাবেন। পুলিস সতর্ক থাকবে। কিন্তু ওর বিপক্ষদলের লোকেরা তাকে সন্দেহ করবে না। ভাববে, কোনো পাগলের কাণ্ড—যে হতভাগা নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে আব ফকির সেজে ঝড়ে মরা কাকটার কৃতিত্ব দাবী করতে চায়।

—বুঝলাম। এ ক্ষেত্রে আপনি কী করতে চান ?

—আসানসোলে কোনো স্পেশাল-স্কোয়াড নিশ্চয়ই পাঠাবো না। ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখব অবশ্য। যাতে আসানসোল থানা সজাগ থাকে।

—আমার আর কিছু করণীয় আছে ?

—আপনি আবার কী করবেন। আপনি পুলিসে রিপোর্ট করেছেন, পাগলের চিঠিখানার অরিজিনাল কপি পৌঁছে দিয়েছেন, ব্যস ! আপনার করণীয় কাজ একটিই—এ ব্যাপারটা স্রেফ্ ভুলে গিয়ে নিজের কাজকর্মে মগ্ন থাকা।

—থ্যাঙ্কস্।

বাসুসাহেব তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে ফিরে গেলেন নিশ্চিন্ত মনে।

দুই

বেডন স্ট্রীটের একটা ভাঙা দোতলা বাড়ি। একতলায় একজন ডাক্তারের চেম্বার। তিনিই গৃহকর্তা। ডাক্তার দাশরথী দে। একতলার অংশটা ভাড়া দেওয়া। দ্বিতলে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব আস্তানা। স্বামী

স্ত্রী আর একটি মাত্র মেয়ে—মৌ, যাদবপুরে পড়ে। তিনতলায় সিঁড়িঘরের লাগোয়া একটা চিলে-কোঠা। এক বৃদ্ধ ওখানে ভাড়া থাকেন। একা মানুষ। তিনকূলে নাকি তাঁর কেউ নেই। তাঁর গৃহস্থালীর সরঞ্জামও সামান্য। পুব দিকে একটা জানলা, মোটা-মোটা লোহার গরাদ দেওয়া। ঘরে একটি তক্তাপোষ, উপরে সতরঞ্চি পাতা, বিছানাটা মাথার কাছে গোটানো। একপ্রান্তে একটি আলমারি। তালাবন্ধ। সেটা খুললে দেখা যাবে উপরের তাকে শুধু অঙ্কের বই—পাটিগণিত, বীজগণিত, ক্যালকুলাস, জ্যামিতি, কিছু কিছু শিশুসাহিত্যেব বইও। বইগুলি জরাজীর্ণ—মনে হয় সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড দোকানে কেনা। পাতা উল্টে দেখলে বুঝতে পারা যাবে—তা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মালিকের নাম লেখা। শ্রীশিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তী। তারিখ দেওয়া—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার। তুলনায় মাঝের সেলফে এক থাক ঝক্‌ঝকে বই- আনকোরা নতুন, যেন বইয়ের দোকানের একটি তাক। কিছু বইয়ের পাতা কাটা নেই। কিছু প্যাকেট খোলাই হয়নি। সেগুলি ধর্মপুস্তক। উদ্বোধন লাইব্রেরী, বেলুড় মঠ অথবা পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত। অবশ্য এসবই দৃষ্টির আড়ালে—যেহেতু কাঠের আলমারিটি তালাবন্ধ।

যেটুকু দৃষ্টিগোচর তাতে দেখা যায়—ঘরের একপ্রান্তে একটি কাঠের সস্তা টেবিল। একটিমাত্র খাড়া-পিঠ হাতলহীন চেয়ার। কিছু কাগজপত্র—কাগজ-চাপা, পিন-কুশন, আঠার শিশি। আর এসবের সঙ্গে নিতান্ত বেমানান একটি প্রায়-নতুন পোর্টবল্‌ টাইপ-রাইটার।

বৃদ্ধ তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। স্নান করে এসেছেন তিনি। বাথরুম একতলায়, ডিস্‌পেন্সারির সংলগ্ন। প্রতিবার বাথরুমে যেতে তাঁকে তিনতলা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। উপায় নেই। এর চেয়ে সস্তায় কলকাতা শহরে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। তাছাড়া একবেলা তিনি ডাক্তারসাহেবের সংসারে অন্নগ্রহণ করেন। নৈশ আহার। দিনে বাইরেই কোথাও খেয়ে আসেন। সকাল-বিকাল চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। সুতরাং আর কোনো ঝামেলা নেই। ডাক্তারদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, পেয়িং গেস্ট রাখবার প্রয়োজন। হেতুটা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর ছাত্র হচ্ছেন ডক্টর দে। দীর্ঘদিন পূর্বে যখন গৃহকর্তা স্কুলে পড়তেন। শিবাজী ছিলেন ওঁদের স্কুলের থার্ড মাস্টার। অঙ্কের ক্লাস নিতেন তিনি। মৌকে পড়ানোর সুযোগ পাননি, কারণ সে অঙ্ক নেয়নি। কিন্তু মৌ রোজ সন্ধ্যায় ওঁর তিনতলার ঘরে উঠে আসে। টাইপিং শিখতে। সখ হিসাবে।

মাস্টারমশাই তাঁর ঝোলা ব্যাগে খানকতক বই ভরে নিলেন। ধুতি পাঞ্জাবি

পরে পায়ে একটা ফিতে বাঁধা ক্যাম্বিসের জুতো পরলেন। কাল রাত্রেই একটা ছোট স্যুটকেশ গুছিয়ে রেখেছিলেন। সেটাও তুলে নিলেন হাতে। ছাতা? না দরকার নেই। বর্ষাকাল পার হয়েছে। অক্টোবরের আঠারো তারিখ আজ। রোদের তেমন তেজ নেই। ঘরে তালা লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন। দ্বিতলের ল্যাণ্ডিঙে নেমে একটু থমকে দাঁড়ালেন। হাঁকাড় পাড়লেন, বৌমা?

মৌ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এসে বললে, মা বাথরুমে আছেন মাস্টারমশাই। আপনি কি বের হচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ। তোমার মাকে বলে দিও, দু-দিন থাকব না। বিশ তারিখ সন্ধ্যায় ফিরব। রাতে খাব।

—আজ রাতে খাবেন না?

—না। এই তো ট্রেন ধরতে যাচ্ছি।

—একটু কিছু মুখে দিয়ে যান। একেবারে বাসি মুখে…

—না না, কাল একটু দই এনে রেখেছিলাম। চিড়েভিজে দিয়ে সকালেই,…

—কোথায় যাচ্ছেন এবার?

—আসানসোল।

—ও বাবা! সে তো অনেকদূর! থাকবেন কোথায়?

—হোটেল-ধর্মশালা খুঁজে নেব।

মৌ আর কথা বাড়ায় না। বৃদ্ধ টুক্ টুক্ করে নিচে নামতে থাকেন।

মৌ পিছন ফিরতেই দেখে বাথরুম থেকে প্রমীলা বার হয়ে এসেছেন। বললেন, মাস্টারমশাই কি আবার ট্যুরে গেলেন নাকি?

—হ্যাঁ, আসানসোল। পরশু সন্ধ্যাবেলা ফিরবেন বললেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্রমীলার। যেন আপন মনেই বললেন, কী দরকার এ বয়েসে এতটা পরিশ্রম করার? উনি তো কতবার বলেছেন, 'মাস্টারমশাই, ওসব চাকরি ছেড়ে দিন এবার। আমরা তো আছি। আমার বাবা-কাকা থাকলে কি দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতাম না?' কিন্তু কে কার কথা শোনে!

মৌ বলল, পাগল মানুষ তো!

—মৌ!—ধমকে উঠলেন প্রমীলা।

মৌ সলজ্জে বলে, আমি সে কথা বলিনি, মা! কিন্তু আত্মভোলা মানুষ তো! আর সত্যকে তুমিও অস্বীকার করতে পার না। এককালে উনি পাগলা-গারদে আটকও ছিলেন!

—সেই কথাটাই ভুলে যেতে চেষ্টা কর। উনি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। শুধু তোমার নয়, তোমার বাবারও শিক্ষক উনি। বুড়ো মানুষকে সম্মান দিতে শেখ!

মৌ শ্রাগ্ করল। জেনারেশান গ্যাপ্। সে কী বলতে চায়, আর মা তার কী অর্থ করছে। সে আর কথা বাড়ায় না। আজ তার ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস।

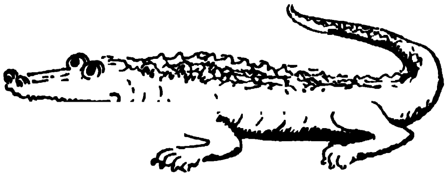

কৌশিক ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে দেখে চতুর্থ চেয়ারটি খালি। রাণীদেবীর দিকে ফিরে জানতে চায়, মামু কোথায় ?

—ভোরবেলা মর্নিং-ওয়াকে গেছেন। এখনো ফেরেননি।

কৌশিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। এত দেরী হয় না তাঁর বেড়িয়ে ফিরতে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সদর দরজা খুলে প্রবেশ করলেন বাসুসাহেব। তাঁর পরিধানে সাদা সর্টস, টুইলের জামা, পুলওভার, পায়ে সাদা মোজা আর হান্টিং শ্যু। বগলে একগোছা দৈনিক পত্রিকা। কাগজের বাণ্ডিলটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, তোমাদের ডিডাক্শানই ঠিক। স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, বসুমতী কোন কাগজেই আসানসোলের কোন খবর নেই।

কৌশিক দ্বিতীয়বার তার মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। এবার সময় নয়, তারিখটা। আজ বিশে অক্টোবর।

ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বললে, সবগুলো কাগজ খুঁটিয়ে দেখেছেন ?

—হ্যাঁ, পার্কের বেঞ্চিতে বসে বসে।

বাড়িতে দুটি কাগজ আসে। একটা বাংলা একটা ইংরাজি। বেলা সাতটা নাগাদ। বেশ বোঝা গেল, বাসুসাহেব মনে মনে একটু চিন্তিত ছিলেন। এ দু-তিন ঘণ্টাও তাঁর সবুর সয়নি। ভোর বেলাতেই পাঁচখানা খবরের কাগজ কিনে নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছেন।

অজ্ঞাত পত্রলেখকের বিষয়েই আলোচনাটা মোড় নিল। কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সে এমন 'প্র্যাক্টিক্যাল জোক'টা করেছিল ? আহারান্তে বিশু যখন চায়ের পটটা রেখে গেল তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। কৌশিক উঠে গিয়ে ধরল। একটু শুনে নিয়ে বলে, মামু, আপনার ফোন, ট্রাঙ্ক-লাইনে।

বাসু এসে ফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, বাসু স্পিকিং

—আমি, স্যার, রবি বলছি, রবি বোস···

—রবি বোস ? আপনাকে তো ঠিক প্লেস করতে পারছি না · কোথায় আমরা মীট করেছি ?···

—চিনতে পারছেন না ? আমি ইন্সপেক্টার রবি বোস, সেই কমলেশ মিত্র মার্ডার কেস্-এ।

—ও! আই সী! তুমি সেই রবি? এখনো লটারীর টিকিট কেনার বাতিকটা আছে?

—না, নেই। এক জন্মে কেউ দু-দুবার জ্যাক-পট হিট করে না!

—আই সী! তুমি ইতিমধ্যে একবার লটারীর টিকিটে মোটা দাঁও মেরেছ তাহলে?

—সেটা তো, স্যার, আপনি জানেনই!

—কই না তো! তুমি তো কখনো জানাওনি!

—জানানোর তো প্রয়োজন ছিল না স্যার! ছিল?*

—না, ছিল না। যা হোক, এখন ফোন করছ কেন? কোথা থেকে বলছ?

—আসানসোল থেকে। আমি এখন আসানসোল সদর থানার ও.সি.।

ভৌগোলিক নামটা শ্রবণমাত্র সচকিত হয়ে উঠলেন বাসুসাহেব। পূর্বমুহূর্তের রসিকতার বাষ্পমাত্র রইল না আর। বললেন, ইয়েস? ফায়ার! আয়াম অল ইয়ার্স।

—কাল রাত্রে, এখানে একটা খুন হয়েছে। মধ্যরাত্রে। একজন নগণ্য দোকানদার। এসব মামুলি খুন নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু গত সপ্তাহে হেড-কোয়ার্টার্স থেকে একটা রহস্যময় চিঠি পেয়েছিলাম—একটা 'ফোর-ওয়ার্নিং'। তাই মনে হল, ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য।

—মধ্যরাত্রে দোকানদার খুন হয়েছে বলছ? কোথায়? বাড়িতে, না দোকানে?

—মধ্যরাত্র ঠিক নয়। রাত দশটা পঞ্চান্ন থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। দোকানেই।

—দোকানের মালপত্র বা ক্যাশ্...

—না, স্যার, কিচ্ছু খোয়া যায়নি। মোটিভ অন্য কিছু। লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফলে নারীঘটিত ব্যাপার বলে মনে হয় না। রাজনীতির ধারেকাছে লোকটা কোনদিন ছিল না—সুতরাং পলিটিক্যাল মার্ডারও নয়। বিরাট সম্পত্তির মালিক নয় যে, উইলঘটিত...

—বাট হোয়াই দেন?

—সেটাই চরম রহস্য! আমার তো মনে হচ্ছে—'কে' প্রশ্নটাকে ছাপিয়ে উঠেছে: 'কেন'!

—তোমার বড়কর্তাকে টেলিফোনে জানিয়েছ? তিনি কি বলেন?

---

* 'ঘড়ির কাঁটা'-তে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

—তার মতে পিয়োর কোয়েন্সিডেন্স। কাকতালীয় ঘটনা। অর্থাৎ আপনার পত্রপ্রাপ্তি এবং অধরবাবুর মৃত্যু…

—কী নাম বললে ? হলধর ?

—না স্যার। অ-ধ-র। A for Alligator, D for Delhi ..

—বুঝেছি। অধর। পুরো নামটা কি ?

—অধরকুমার আঢ্যি। অদ্ভুত কোয়েন্সিডেন্স। নয় ?

বাসু বললেন, শোন রবি। তুফান মেলটা অ্যাটেণ্ড কর। আমি যাচ্ছি। আমরা দুজন। কোনও হোটেল…

—হোটেল কেন স্যার ? আমার গরীবখানাতেই থাকবেন। আপনাকে ঐ লটারীর টাকা পাওয়ার পর…

—হ্যাং য়োর লটারি। সন্দেহজনক সব কজনকে যেন সন্ধ্যাবেলায় পাই। আমরা আসছি।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে উনি প্রাতরাশের টেবিলের দিকে ফিরে দেখেন সবাই উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে। উনি কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, তৈরী হয়ে নাও। আমরা তুফানে আসানসোল যাচ্ছি। বুঝেছ নিশ্চয ? লোকটা ফাঁকা হুমকি দেয়নি।

রাণী বলেন, এটা নেহাৎই একটা কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না ?

—সম্ভবত নয়। কারণ মৃত লোকটা 'অধর আঢ্যি অফ আসানসোল'—'A'-র অ্যালিটারেশন।

অধরবাবুর দোকানটা খুবই ছোট। একটা ডবল বেড খাটের মাপে। তবে অবস্থানটা জবর জি. টি. রোডের উপর। আসানসোল ই. আই.আর. স্কুলের বিপরীতে। মনিহারী দোকান। অধরবাবুর আদি-বাড়ি পূর্ববঙ্গে। বয়স ষাট-বাষট্টি। পার্টিশানের সময় বাপের হাত ধরে এ দেশে আসেন। দোকানটা খুলে ছিলেন ওঁর বাবাই। উত্তরাধিকার সূত্রে এখন উনিই ছিলেন তাঁর মালিক। বিপত্নীক। দুই ছেলে, মেয়ে নেই। বড ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, কুলটিতে সস্ত্রীক বাস করছে। সেখানেই চাকরি করে। ছোটটি ওঁর কাছেই থাকে। ক্লাস টেন-এ পড়ে—সামনের ঐ স্কুলে। দোকানঘরের উপরে এক কামরার একটি ঘরে বাপ-বেটায় থাকতেন। ঠিকে ঝি বাসন মেজে যেত। রান্না করতেন অধরবাবু নিজেই।

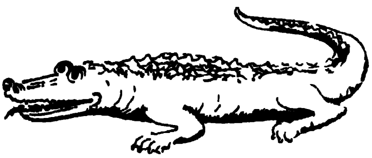

মৃত্যুর সময়টা নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে :

অধরবাবুকে জীবিত অবস্থায় শেষবার দেখেছে ওঁর ছোট ছেলে সুনীল। রাত

দশটা নাগাদ সে নেমে এসে বাবাকে বলেছিল, দোকান বন্ধ করবে না? অনেক রাত হয়ে গেল যে!

অধরবাবু ঘড়ি দেখে বলেছিলেন, দশটা দশ হয়েছে। তুই আর একটু জেগে থাক। আধঘণ্টার মধ্যেই আসব আমি। হিসাবটা আজ রাতেই শেষ করে রাখব।

এরপর সুনীল উপরে উঠে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই পড়তে থাকে। তারপর সে দরজা খোলা রেখেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে। তার বাবা যে রাত্রে খুন হয়েছে তা সে জানতে পারে পরদিন ভোরবেলা। যখন ঘুম ভেঙে দেখে দরজা খোলা। বাবা ঘরে নেই। তখন সবে আলো ফুটছে। ঠিক কটা তা সুনীল জানে না। ওর বাবা খুব ভোরে ওঠেন—কিন্তু ছেলেকে ডেকে দেন। এভাবে দরজা খুলে রেখে নেমে যান না। তাই সুনীল একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একছুটে নেমে এসে দেখে যে, দোকান ঘরও হাট করে খোলা। আর কাউণ্টারের ঠিক তলাতেই অধরবাবু ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে আছেন। মৃত। রাস্তা থেকে সেটা নজরে পড়ে না। তখন একটু একটু করে আলো ফুটেছে। দু-চারজন লোক পথ দিয়ে যাতায়াত করছে। মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার নাকে ফেট্টি জড়িয়ে ঝাড়ু চালাচ্ছে।

—তাহলে কেন তখন টেলিফোনে বললে যে, রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে খুন হয়েছে?—জানতে চাইলেন বাসুসাহেব।

বিস্তারিত বিবরণটা শোনাচ্ছিল থানা-অফিসার রবি বোস। থানাতেই। কৌশিক বসে আছে পাশের চেয়ারটায়। তুফান মেল অ্যাটেণ্ড করে ওঁদের দুজনকে রবি নিয়ে এসে বসিয়েছে তার অফিসে। রবি জবাবে বলল, তার কারণ —সাধনবাবুর জবানবন্দি। উনি নাইট শো সিনেমা দেখে রিকশা করে সস্ত্রীক ফিরছিলেন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। উনি ধূমপায়ী। পকেটে হাত দিয়ে হঠাৎ দেখেন সিগারেট ফুরিয়েছে। নাইটশো সিনেমাটা ভেঙেছে রাত ঠিক এগারোটা কুড়িতে। ফলে, আন্দাজ এগারোটা পঁচিশ নাগাদ তিনি জি.টি. রোড দিয়ে পাস করছিলেন। হঠাৎ ওঁর নজরে পড়ে একটি দোকান খোলা আছে। লোড-শেডিং চলছিল। সব দোকান বন্ধ। শুধু ঐ দোকানটিতে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। কাউণ্টারের উপর একটা মোমদানিতে। কিন্তু ওঁর স্পষ্ট মনে আছে, মোমবাতিটা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, দপ্ দপ্ করছিল। অধরবাবুর দোকানে যে সিগ্রেট পাওয়া যায় তা ধূমপায়ী ভদ্রলোকটির জানা ছিল। তিনি রিক্শা থামিয়ে দোকানের কাছে এগিয়ে যান। কাউকে দেখতে পান না। দোকানের মালিকের নামটা তিনি জানতেন না—তবে টাকমাথা এক ভদ্রলোক যে দোকানটায় বসেন এটা তার জানা ছিল। 'ও মশাই! শুনছেন? ভিতরে কে

আছেন ?'—ইত্যাদি বার কয়েক হাঁকাড় পেড়েও কারও সাড়া পান না। ঐ সময়ে তাঁর নজরে পড়ে কাউণ্টারের উপরে পড়ে আছে একটা খোলা হিসাবের খাতা আর একটা ডট পেন। আর তার পাশেই একটা বই—উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। ইতিমধ্যে রিক্সা থেকে ওঁর গিন্নী তাড়া দিলেন। মোম-বাতিটাও দপ করে নিবে গেল। সাধনবাবু টর্চের আলোয় রিক্সায় ফিরে আসেন। সিগারেট কেনা হয়নি তাঁর।

বাসু বললেন, বুঝলাম। খুব সম্ভবত সাধনবাবু যখন হাঁকাহাঁকি করছিলেন, তখন দোকানের মালিক ওঁর কাছ থেকে হাতখানেক তফাতে মরে পড়ে আছেন। কিন্তু কাউণ্টারটা আড়াল করায় রাস্তার সমতলে দাঁড়িয়ে তিনি তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। ফলে, নাইণ্টিনাইন পার্সেণ্ট চান্স সাড়ে এগারোটার আগেই উনি খুন হয়েছেন। কিন্তু দশটা পঞ্চান্নর পরে কেন ? ওঁর ছোট ছেলে সুনীল তো তার বাপকে জীবিতাবস্থায় দেখেছিল রাত দশটা দশে ?

—কারণ সুনীলের স্পষ্ট মনে আছে যে, সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে লোড-শেডিং হয়নি। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ঐ এলাকায় কাল রাত্রে লোড-শেডিং শুরু হয় দশটা বাহান্নয়। তারপর অধরবাবু মোমবাতি জ্বালতে আন্দাজ মিনিট-তিনেক সময় নিয়েছেন নিশ্চয়। ফলে দশটা পঞ্চান্ন। এছাড়া আমি একটা বিকল্প পরীক্ষা করেও দেখছি। অধরবাবুর দোকান থেকে ঐ বাণ্ডিলের আর একটি মোমবাতি জ্বেলে আজ সকালে দেখেছি সেটা পুড়ে শেষ হতে ঠিক পঁচিশ মিনিট সময় লাগে।

—গুড ওয়ার্ক ! কিন্তু একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে যে রবিবাবু। দশটা পঞ্চাশ থেকে এগারোটা পঁচিশ হচ্ছে আধঘণ্টা। কিন্তু মোমবাতির আয়ু যে পচিশ মিনিট !

—কথাটা আমিও ভেবেছি। হয়তো, সে মোমবাতিটা একটু বড় ছিল।

—একটু বড় নয়, টুয়েল্ভ পার্সেণ্ট বড় ! পঁচিশ মিনিটের বদলে আধঘণ্টা। দ্বিতীয়ত—সিনেমা হাউস থেকে জি. টি. রোডের ঐ জায়গাটায় রিকশায় আসতে কতক্ষণ সময় লাগার কথা ? আই মীন—গভীর রাত্রে, ফাঁকা রাস্তা পেলে ?

—মিনিট পাঁচেক।

—তাহ্লে আরও অন্তত মিনিট পাঁচেক আন-অ্যাকাউন্টেড থেকে যাচ্ছে ! তাই নয় ? সিনেমা ভাঙামাত্র সাধনবাবু সস্ত্রীক 'হল' থেকে ভীড় ঠেলে বার হয়ে এসে রিক্সা ধরেননি নিশ্চয়। তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলে কি যে, শোর শেষ পর্যন্ত ওঁরা দেখেছেন কিনা ?

—না স্যার। ও সম্ভাবনাটা আমার মনে হয়নি। থ্যাঙ্কু স্যার। আমি জিজ্ঞাসা করব।

কৌশিক হঠাৎ বলে বসে, খুব সম্ভবত তিনি শেষ পর্যন্তই দেখেছেন। এবং তা হলে টাইম এলিমেণ্টটা আরও জটিল হয়ে পড়ছে যে মোমবাতির আয়ু পঁচিশ মিনিট তা অন্তত পঁয়ত্রিশ মিনিট জ্বলেছে!

বাসুসাহেব পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, আদৌ নয়! রবিবাবুর ডিডাক্‌শান কারেক্ট। খুনটা হয়েছে দশটা পঞ্চান্নর পরে এবং সাড়ে এগারোটার আগে।

কৌশিক বলে, কিন্তু মোমবাতিটা তাহলে··· ?

বাসু বলেন, মোমবাতি যথারীতি পঁচিশ মিনিটই জ্বলেছে। মোমবাতি যারা বানায় তারা ছাঁচে ঢেলে বানায়। এক-আধ মিনিটের বেশি এদিক-ওদিক হওয়ার কথা নয়।

—তাহলে ?

—বুঝলে না ? ধরা যাক, একটা লোক এগারোটা পাঁচে ওঁর দোকানের সামনে এলো। তখন চতুর্দিকে লোড-শেডিং। একটি মাত্র দোকানে একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। অর্থাৎ নীরন্ধ্র অন্ধকারে একশ গজ দূর থেকেও আবছা দেখা যাচ্ছে দোকানের ঐ আলোটা। হয়তো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দোকানদারকে আর আততায়ীর শিলুয়ে। লোকটা দেখতে পেল পিছনের কাউন্টারে কোন জিনিস —সেটা হরলিক্স, মাথার তেল, টুথপেস্ট যাই হোক। সেটাই কিনতে চাইল। স্বাভাবিক দোকানদার পিছন ফিরবে। তৎক্ষণাৎ আততায়ী ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল বাতিটা আর তৎক্ষণাৎ খুন করল লোকটাকে। অন্ধকারেই সে টেনেটুনে মৃতদেহটা ঠেলে দিল কাউন্টারের তলায়। হয়তো দেখে নিল চারদিক। ঠিক সে সময়ে যদি জি. টি. রোড দিয়ে কোনও ট্রাক বা রিক্সা পাস করে তাহলে অপেক্ষা করবে। চারদিক সুনসান্ হয়েছে বুঝলে লাইটার জ্বেলে মোমবাতিটা আবার জ্বালবে। কারণ সে তখন নিশ্চিন্ত যে, বহুদূরের প্রত্যক্ষদর্শী যদি আদৌ কেউ থাকে সে তখন দেখবে দোকান থেকে একজন খরিদ্দার ফিরে যাচ্ছে। দমকা হাওয়ায় যে মোমবাতিটা নিবে গিয়েছিল সেটা আবার জ্বালা হয়েছে! দোকানি

হয়তো ভিতর দিকে গেছে অথবা নিচু হয়ে কিছু করছে। ফলে মোমবাতি তার নির্দিষ্ট মেয়াদের একতিলও বেশি জ্বলেনি!

বাসুসাহেব সকলের এজাহার নিলেন। একে একে। রবি বসু তাঁদের আসতে বলেছিল। কারও কোন উক্তি থেকে নতুন কিছু আলোকপাত হল না। ইতিমধ্যে কুলটি থেকে অধরবাবুর বড় ছেলে কার্তিক সস্ত্রীক এসে পড়েছে। সে

কুলটিতে একটা কারখানায় কাজ করে। সন্তানাদি এখনো হয়নি। বছর তিনেক বিবাহ করেছে। বাপের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল। বাপকে খুন করে দোকানটা দখল করবার চেষ্টা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ চাকরি ছেড়ে সে দোকান দেখতে পারে না। কোন বিশ্বস্ত লোক তাকে মোতায়েন করতেই হত। আর বাপের চেয়ে বিশ্বস্ত লোক সে কোথায় পাবে?

হিসাবের খাতা অনুসারে দেখা গেল—চেনা-জানা খরিদ্দারদের কাছে বেশ কিছু ধার আছে। 'বেশ কিছু' মানে মিলিত অঙ্কটা—প্রায় হাজার খানেক টাকা। কিন্তু কোন একজনের কাছে দেড়শ টাকার বেশি নয়। এত সামান্য টাকার জন্য কেউ মানুষ খুন করে না।

অধরবাবু রাজনীতির ধারে-কাছে ছিলেন না। বার্ণপুর-কুলটি অঞ্চলের লেবার ইউনিয়নের কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই। মস্তান-পার্টিদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি। স্ত্রীলোকঘটিত কোন বদনাম নেই। সে রাত্রে ক্যাশকাউন্টারে সাড়ে সাতশ মতো টাকা ছিল। খোলা ড্রয়ারে। সেটা খোয়া যায়নি।

ঠিকই বলেছিল রবি। 'কে' প্রশ্নটা ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে যে প্রশ্নটা, তা 'কেন'?

সাধনবাবুকে বিস্তারিত জেরা করলেন বাসুসাহেব। কিন্তু ইতিপূর্বে পুলিসকে যা বলেছেন তার বেশি কিছু যোগ করতে পারলেন না। শুধু বললেন, একটা কথা বলি স্যার, আগে ওটা খেয়াল হয়নি—ঐ দুটো একটু ইন্‌কম্পাটেব্‌ল্ নয়? রাত বারোটায় সান্‌-মাইকা-টপ্ দোকানের কাউন্টারে পাশাপাশি দুজনে শুয়ে আছেন? একজন মনিহারি দোকানের খাতা আর দ্বিতীয়জন শ্রীমদ্ভাগবতগীতা!

বাসু বললেন, অধরবাবু বোধকরি আর এক রামপ্রসাদ! হিসাবও কষেন, গীতাও পড়েন।

বইটি উনি পরীক্ষা করে দেখলেন। আনকোরা নতুন। উদ্বোধন প্রকাশনীর। মালিকের নাম লেখা নেই কোথাও। সুনীল বা কার্তিক বইটি কখনো দেখেনি বলল।

সান-মাইকা-টপ্ টেবিলে কোনও ফিঙ্গার-প্রিণ্ট নেই। এমন কি মৃত অধরবাবুরও নয়। আততায়ী সব কিছু মুছে দিয়ে গেছে।

ফিরে আসবার মুখে কার্তিক কাতরভাবে প্রশ্ন করল, কে এভাবে ওঁকে খুন করল স্যার? কী ভাবেই বা মুহূর্তমধ্যে…

বাসুসাহেব বললেন, কে করেছে, কেন করেছে তা বলতে পারছি না কার্তিকবাবু। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি—তিনি খুব বেশি যন্ত্রণা পাননি। মুহূর্তমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আততায়ী তাঁর পিছন ফেরার সুযোগে তাঁর

মাথায় খুব ভারি কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে। সম্ভবত লোহার ডাণ্ডা অথবা লম্বা হাতলওয়ালা হ্যামার—যেটা সে কোটের আস্তিনে লুকিয়ে এনেছিল। ওঁর 'সেরিবেলাম' বিচূর্ণ হয়ে যায়। হয়তো পিছন ফিরে আততায়ীর মুখখানাও তিনি দেখে যাননি।

ঘরের ওপ্রান্তে বসেছিল একটি ষোল-সতের বছরের কিশোর দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। ডুগ্‌রে কেঁদে ওঠে সে। বাসুসাহেব উঠে এসে তার মাথায় হাতটা রাখলেন। অশ্রু-আর্দ্র লাল একজোড়া চোখ তুলে সুনীল বললে, আমি…আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি না স্যার?…পুলিস কিছু করবে না! আমার বাবা যে গরিব…

বাসু বললেন, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পার সুনীল। মাস-খানেক পরেই তোমার টেস্ট পরীক্ষা। মন খারাপ না করে বাবা যা বলতেন সর্ব-প্রথম তাঁর সেই ইচ্ছাটাই পুরণ করবার চেষ্টা কর। ভালভাবে পাস করবার চেষ্টা কর। দোকানটা তো তোমাকেই দেখতে হবে।

—না, আমি বলছিলাম, ঐ লোকটাকে ধরবার জন্য…

—আমার মনে থাকবে। প্রয়োজন হলেই তোমাকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু ততদিন তুমি নিজেকে শক্ত করে রাখ। পডাশুনাটা ছেড না। কেমন?

সুনীল আস্তিনে চোখটা মুছে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তিন

গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা এটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। বাসুসাহেবের পত্র এবং অধরবাবুর পঞ্চত্ব। এ দুটি 'প্রাপ্তি' যোগ নিঃসম্পর্কিত। 'কে' খুন করেছে সেটা বোঝা না যাবার একটিই হেতু: অধরবাবুর জীবনে এমন একটা অনুদ্ঘাটিত অধ্যায় আছে, যার কথা এখনো জানা যায়নি। হয়তো জানতেন অধরবাবু এবং আততায়ী। এন্‌কোয়ারি? সে তো রুটিন মাফিক হচ্ছেই। খবরটা এতই নগণ্য যে, দুদিন পরে দু-একটি সংবাদপত্রে ভিতরের পাতায় 'অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক আসানসোলে দোকানদার নিহত' সংবাদটা যে ছাপা হয়েছিল তা সুনীল, কার্তিক এবং বাসু-পরিবারের কজনের বাইরে হয়তো কারও নজরেই পড়েনি।

কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল যখন বাসুসাহেব দ্বিতীয় একখানা পত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন পুলিসের কাছে।

একই জাতের খাম, একই জাতের কাগজে, সম্ভবত একই টাইপ-রাইটারে ছাপা। কাগজটার পিছন দিকে জ্যামিতির একটা প্রতিপাদ্য প্রমাণের চেষ্টা করা

হয়েছিল। কাগজটা লম্বালম্বিভাবে ছিঁড়ে ফেলায় অঙ্কটা বোঝা যাচ্ছে না। পরপৃষ্ঠায় একটা ছাপা-ছবি অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা। জীবটা অদ্ভুতদর্শন। এবার রঙিন ছবি নয়। একরঙা। তার তলায় লেখা:

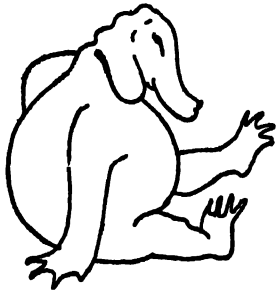

'B' FOR BECHARATHERIUMAIH NAMAH !

"শ্রীযুক্ত বাবু পি. কে. বাসু, বাব-অ্যাট-লযেষু,

"বেচারা মহাশয়,

"পঞ্চবিংশতিটি সুযোগ বাকি থাকিতেই এতটা মুষড়াইয়া পড়িলেন কেন ?

"গাড্ডু কে না মারে ?

"ট্রাই-ট্রাই-ট্রাই এগেন : 'B' FOR BURDWAN ! তাং : এ মাসের সাতাশে। ইতি

গুণমুগ্ধ
B-C-D"

এস. এস. ওয়ান, অর্থাৎ স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বার্ডওয়ান রেঞ্জ বললেন, দেখা যাচ্ছে, আপনার অনুমানই ঠিক। অধরবাবুর খুন আর আপনার ঐ রহস্যজনক পত্র সম্পর্ক বিযুক্ত নয়। লোকটা আবার হুমকি দিয়েছে। আজ বাইশ তারিখ। পুরো পাঁচদিন সময় আছে। রাস্কেলটাকে এবার ধরতেই হবে! যেমন করে হোক!

—কিন্তু কী স্টেপ নিতে চাইছেন আপনারা ?

—সমস্ত ব্যাপারটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে। 'B' অক্ষর দিয়ে যাদের নাম এবং বর্ধমানে থাকে, তারা যাতে সাবধান হতে পারে।

—নাম না উপাধি ?

—ও ইয়েস্। অধর আঢ্যির নাম উপাধি দুটোই ছিল 'এ' দিয়ে।

আই. জি. ক্রাইম বললেন, কিন্তু তাতে কি আমরা রাস্কেলটার ফাঁদেই পা দিচ্ছি না ? আমার ধারণা লোকটা 'মেগ্যালোম্যানিয়াক'—অর্থাৎ তার মস্তিষ্কবিকৃতির অবচেতনে আছে একটা আকাশজোড়া 'হামবড়াই' ভাব !

বাসুসাহেবের উপর সে টেক্কা দিতে চাইছে। সে পাব্‌লিসিটি চাইছে। মানে 'নটোরিটি'। কাগজে সব কথা জানিয়ে দিলে তার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। সে যা চায়,—বাসুসাহেবের চেয়ে বেশি নাম—তা সে 'বিখ্যাত'ই হোক বা 'কুখ্যাত'ই —তাই সে পেয়ে যাবে।

সি. আই. ডি. সিনিয়ার ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, আপনি কী বলেন বাসুসাহেব?

বাসু বললেন, এ ক্ষেত্রে আমি একজন পার্টি। আমার কিছু বলা শোভন হবে না। লোকটা আমাকেই 'চ্যালেঞ্জ থ্রো' করেছে। যদি আমি বলি—'খবরের কাগজে সব কিছু ছাপা উচিত নয়' তাহলে কেউ মনে করতে পারেন 'ব্যাচারা-থেরিয়াম' মুখ লুকাতে চাইছে। তাই আমার পরামর্শ—আজ সন্ধ্যায় একটা কনফারেন্স ডাকুন। দু-একজন ধুরন্ধর ক্রিমিনলজি এক্সপার্ট এবং মনস্তত্ত্ববিদ, আমরা কজন তো আছিই আর ও. সি. বর্ধমানকে একটা ফোন করে অ্যাটেণ্ড করতে বলুন। আপনারা সবাই মিলে স্থির করুন—কী কী স্টেপ আমরা নেব, খবরের কাগজে সব কিছু ছাপিয়ে দেব কিনা।

আই. জি. ক্রাইম বললেন, যুক্তিপূর্ণ কথা। তাই করুন। বিকাল পাঁচটায় আপনার অসুবিধা হবে না তো বাসুসাহেব?

—না। আসানসোলের কেসটার আর কোন ক্লু পাওয়া গেল?

—হ্যাঁ, একটা মাইনর ক্লু। ঐ আন্‌কোরা 'গীতা' বইখানা কোথা থেকে এল। রবি আরও ইন্টেন্সিভ এন্‌কোয়ারি করে জেনেছে—একজন ফেরিওয়ালা সন্ধ্যা নাগাদ ঐ পাড়ায় কিছু বই বিক্রি করতে এসেছিল। অধরবাবুর দোকানের পরের পরের দোকানদার তার কাছে কী একটা ধর্মপুস্তক কিনেছিলেন। একটা বুড়ো মত লোক, ঝোলায় করে বই ফিরি করছিল। টেন-পার্সেন্ট কমিশনে সে বাড়ি-বাড়ি বই বিক্রি করে। সম্ভবত অধরবাবু তার কাছেই বইটা কেনেন।

—বুড়ো মতন লোক? কী-রকম দেখতে কিছু বলেছে? লম্বা না বেঁটে, দাড়ি-গোঁফ...

বাধা দিয়ে আই. জি. সাহেব বলেন, ছাটস্‌ ইম্মেটিরিয়াল। ফেরিওয়ালা বই বেচতে এসেছিল সন্ধ্যায়। অথচ খাট স্নীল তার বাবাকে রাত দশটা পর্যন্ত জীবিত দেখেছে।

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, তা বটে। তবু আজ সন্ধ্যায় কি রবি বসুকেও আনানো যায় না?

আই. জি. সাহেব শ্রাগ্‌ করলেন। বলেন, যাবে না কেন? একটা ফোন করলেই সে চলে আসতে পারবে। এখন তো সকাল সাড়ে দশটা। কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে ব্যারিস্টার সাহেব?

—আছে! আরও একটা অন্যায় অনুরোধ করব, দেখুন যদি মঞ্জুর করা সম্ভবপর হয়।

—বলুন?

—আপনারা মেনে নিয়েছেন 'আসানসোল' আর 'বর্ধমান' দুটো বিচ্ছিন্ন কেস নয়। দুটো খুন একই আততায়ীর হাতের কাজ—

ইন্সপেক্টার বরাট বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনার ডিডাক্‌শানটা একটু প্রিম্যাচিওর হয়ে যাচ্ছে না বাসুসাহেব? 'বর্ধমানে' কোনও খুন হয়নি। হবেই, এমন কোন গ্যারান্টি নেই।

বাসু একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, অল রাইট—চক্রধরপুর, চিনসুরা বা চাকদার কেসের পর না হয় সে বিষয়ে আলোচনা করব—

আই. জি. সাহেব বরাটের দিকে একটা ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলেন, না না, ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত সিরিয়াস। একজন 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়্যাক' সমাজে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও সে বাসুসাহেবকে চিঠি লিখছে—কিন্তু চালেঞ্জটা আমাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। আসানসোলের কেসটাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিইনি। এবার আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে চাই। বলুন, বাসু-সাহেব কি যেন বলছিলেন?

—আমি বলতে চাই, লোকটা কে জানি না, উদ্দেশ্য কী তাও জানি না; কিন্তু তার কর্মপদ্ধতি সে পূর্বাহ্ণেই ঘোষণা করেছে। 'এ.বি.সি.' করে সে ক্রমাগত খুন করে যাবে। আসানসোলে সে আমাদের বেইজ্জৎ করেছে। বর্ধমানে করতে যাচ্ছে সাতাশ তারিখে। এর পর 'চুঁচুড়া' 'চাকদহ' 'চন্দ্রকোণারোড' কোন একটা জায়গা সে বেছে নেবে। প্রত্যেকটি এলাকা ভিন্ন ভিন্ন ও. সি-র এক্তিয়ারে। আপনারা কি মনে করেন না একজন বিচক্ষণ 'অফিসার-অন-স্পেশাল-ডিউটি' নিয়োগ করে প্রতিটি কেস্‌কে লিংক-আপ্ করা উচিত? না হলে প্রতিটি থানা-অফিসার খণ্ডখণ্ড চিত্রই শুধু পাবে। আততায়ীকে ধরা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

—য়ু আর পার্ফেক্টলি কারেক্ট। একজন সিনিয়ার ইন্সপেক্টরকে আমরা O.S.D. করে দেব। সে আপনার সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ট থাকবে। ইন্ ফ্যাক্ট—আপনার নির্দেশেই সে কাজ করবে। আমি আপনাকেই পূর্ণ দায়িত্বটা দিতে চাই ব্যারিস্টারসাহেব!

ইন্সপেক্টার বরাট আর এস. এস. ওয়ান-এর দৃষ্টি বিনিময় হল। আই. জি. ক্রাইম যে আরক্ষা বিভাগের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি আই. জি.-রও। তাই ইন্সপেক্টার বরাটের দিকে ফিরে বললেন, আপনার সি. আই. ডি. সমান্তরালে কাজ করে যাবে। আমি তাতে কোন হস্তক্ষেপ করছি না। কিন্তু অজ্ঞাত আততায়ী যেহেতু বাসু-

সাহেবকেই বারে-বারে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখছে তাই তাঁকে আমি এ সুযোগটা দিতে চাই। আমি আশা করব, আপনারা সমান্তরালে তদন্তের বার্তা বিনিময় করে পরস্পরকে অবহিত করবেন। কোনক্রমেই যেন রাস্কেলটা 'B' পার হয়ে 'C'-তে না পৌঁছাতে পারে। এখন বলুন ব্যারিস্টারসাহেব, আপনি কি এ তদন্তের জন্য অ্যাসিস্টেণ্ট হিসাবে বিশেষ কাউকে পেতে চান? আপনি এদের অনেককেই চেনেন।

—তা চিনি। আমি খুশি হব যদি আসানসোল সদর থানায় নেক্সট-ম্যানকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে রবিকে আপনারা মুক্তি দেন। মাসখানেকের জন্য রবি বোসকে আমার সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিন। ছোক্‌রা ভারি কাজের, এবং বুদ্ধিমান!

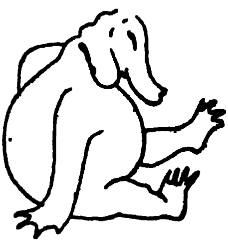

—তাই হবে, আমি ব্যবস্থা করছি। সে আজ সন্ধ্যার মিটিঙে আসবে। থানার চার্জ নেক্সট-ইন-কমাণ্ডকে সাময়িকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে।

—থ্যাঙ্কু।

একুশ তারিখ, সকাল।

ডাক্তার দে তিনতলায় উঠে এসে দেখলেন মাস্টারমশাই টেবিলে বসে একমনে কি যেন টাইপ করছেন। দরজা খোলাই ছিল। ডাক্তার দে ঘরে প্রবেশ করে ওর খাটে বসলেন। তবু বৃদ্ধের হুঁস হল না। দাশরথী ঝুঁকে পড়ে দেখলেন —মাস্টারমশায়ের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা একশ বাহান্ন।

একটু গলা খাঁকারি দিলেন তিনি।

—কে? ও তুই? দাশু? কখন এলি?

—একটু আগে। আপনার লেখা কতদূর হল?

—আর্যভট্ট চ্যাপটারটা শেষ হয়ে এল।

দাশরথী জানেন, এ পাণ্ডুলিপি কোন দিনই ছাপা হবে না। আজ ছয় মাস ধরে উনি লিখছেন, কাটাকুটি করছেন, আর কপি করছেন। অজ্ঞাত লেখকের "স্টাডি অফ্ ম্যাথ্‌মেটিক্স ইন অ্যানসেণ্ট ইণ্ডিয়া" কোন প্রকাশকই কোনকালে ছাপবে না। তা জেনেও মাস্টারমশাইকে উৎসাহ দিয়ে যান: 'অকুপেশনাল থেরাপি!' মনোমত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলেই ওঁর মানসিক ভারসাম্য আবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যাবে না।

বললেন, আমি বলি কি স্যার, আপনি ক্যানভাসারের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য ঐ লেখাটা নিয়ে পড়ুন। মাসে-মাসে ঐ কটা টাকার জন্য ··

—ঐ কটা নয়, দাশু! সাড়ে চার শ! বইটা ছাপতে খরচও তো আছে।

—সে দায়িত্ব আমাদের। আপনার ছাত্রদের। আপনি তা নিয়ে কে ভাবছেন ?

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, এসব কথা তুমি আগেও বলেছ দাশু। দুটো কারণে আমি চাকরিটা ছাড়ছি না। এক নম্বর, এতে বাধ্যতামূলকভাবে আমি অ্যাকৃটিভ্ থাকছি। আমি যে রকম গেঁতো, চাকরি ছাড়লে দিনরাত বসে বসে লিখব। তার মানেই অজীর্ণ, ব্লাডপ্রেসার···

—কেন ? সপ্তাহে তিনদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরী যাবেন। রেফারেন্সও তো দরকার···

—তা দরকার। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটা কি জানিস দাশু ? জীবনভর অঙ্কই শুধু কষে গেলাম। ভগবানের নাম তো কোনদিন নিইনি। পারানির কড়ি গুনে দেব কি দিয়ে ? আসলে কাজটা তো ভাল—বাড়ি-বাড়ি ভাল ভাল বই ফিরি করে আসা। কথামৃত, গীতা, রামায়ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এঁদের লেখা বই।

—এরপরে আর কথা নেই। দেখি, হাতটা দিন। আজ আপনার ইন্জেকশান নেবার দিন।

বৃদ্ধ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন, কী ওষুধ রে ওটা ?

—নাম শুনে কী বুঝবেন ? 'অ্যানাটেন্সল্ ডিকোনায়েড'।

—এ ইন্জেকশনে কী হয় ?

ডাক্তার দে হেসে বলেন, 'অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন/ইহলোকে সুখী, অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন।'

অট্টহাস্য করে ওঠেন বৃদ্ধ। বলেন, না। আমি তো একেবারে ভালো হয়ে গেছি। মাস-তিনেকের মধ্যে একবারও 'এপিলেকটিক ফিট' হয়নি। কারও গলা টিপেও ধরিনি।

—স্মৃতিশক্তি ?

—না। সে জটিলতাটা আছে। পিথাগোরাস থিওরেম বল, বাইনোমিয়াল থিওরেম বল, নাইন-পয়েন্ট সার্কেলের প্রুফটা বল—গড়গড় করে বলে যাব। কিন্তু যদি বলিস—কাল বিকালে কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, হয়তো কিছুতেই মনে করতে পারব না। ও মাসে মৌ ওদের কলেজ সোসালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হিসাব মতো আমি নাকি বৌমার সঙ্গে তিন ঘণ্টা নাচ-গান-অভিনয় দেখেছি। কিন্তু পরদিন সকালে সব, স-ব ব্ল্যাঙ্ক। মৌ অনেক হিন্টস্ দিল—কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না—পূর্বরাত্রের সন্ধ্যাটা আমার কেমন ভাবে কেটেছে।

—হুম্। কিন্তু তাহলে আশ্রমের নির্দেশমত আপনি কী করে বাড়ি-বাড়ি বই ফিরি করেন ?

—এই যে, ডায়েরি দেখে দেখে। এই দ্যাখ না, কাল যাব শ্রীরামপুর, পরশু অফ, চব্বিশে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে 'প্রিয়া' সিনেমা থেকে গড়িয়াহাটের মোড় পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাঁ-দিকের দোকান, পঁচিশে ছুটি, ছাব্বিশে বর্ধমান—ফিরব আঠাশে সকালে···সব ডায়েরিতে লেখা আছে।

—আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনার সেদিনের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে ?

—কোন্‌টা রে ?

—সেই যে 'পরীক্ষার হল'-এ একটি ছেলেকে টুক্‌তে দেখে আপনি ক্ষেপে গিয়ে তার গলা টিপে ধরেছিলেন ?

মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ নিজের রগ টিপে বসে রইলেন। বললেন, ছেলেটার নাম মনে পড়ে না ! চেহারাটাও নয় !

—আমাদের আগের ব্যাচের ছেলে ?

—কী জানি ! মনে নেই, কি জানিস দাশু। আসলে ঘটনাটা আমার একটুও মনে পড়ে না। এমন কি সেই পূজা-প্যাণ্ডেলে যে ছেলেটা বেলেল্লাপনা করছিল তার গলা টিপে ধরার কথাও নয়। তবে বারে বারে শুনে শুনে একটা মনগড়া ছবি আমি মনে মনে তৈরী করে নিয়েছি। আমার মনের পটে যে ছবি তাতে পরীক্ষার 'হল'-এ যে টুকছিল তার মাথায় শিং ছিল, পূজা-প্যাণ্ডেলের মূর্তিটা সরস্বতীর আর বজ্জাত ছেলেটার ল্যাজ ছিল ! অথচ ঘটনাটা ঘটে দুর্গা-পূজা প্যাণ্ডেলে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে—সত্যি ঘটনাগুলো আমার একদম মনে নেই।

—যাক। ওসব কথা জোর করে মনে আনবার চেষ্টা করবেন না। এখন তো আপনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। না হলে কেউ পারে অমন একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখতে ?

মাস্টারমশাই উত্তরটায় সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষ খুন করবার জন্য আমার হাত এমনভাবে নিশ্‌পিশ্‌ করে কেন বল তো ?

—মাঝে মাঝে তো নয়, এমন ঘটনা আপনার জীবনে মাত্র তিনবার ঘটেছে।

—আসল দোষটা কার জানিস ? আমার বাবার !

—আপনার বাবার ?

—হ্যাঁ ! আমার নামকরণ করাটা। শিবাজী, রাণাপ্রতাপের সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত করে তিনি আমাকে একটা বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি করতে চেয়েছিলেন। আর আমি হলাম গিয়ে নগণ্য থার্ড মাস্টার ! হয় তো সেই ব্যর্থতাই এভাবে তির্যক প্রকাশ পায় !

—ওসব চিন্তা একদম করবেন না স্যার !

—বলছিস ?

ল'ডন স্ট্রীটে আই. জি. ক্রাইমের ঘরে বসেছে একটা গোপন মন্ত্রণা সভা।

বাইশ তারিখ সন্ধ্যা পাঁচটায়।

সকাল বেলা যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আরও কজন যোগ দিয়েছেন।

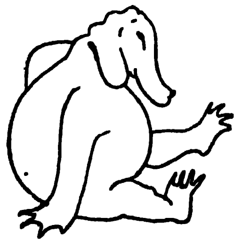

আসানসোল থেকে রবি, বর্ধমান থানার ও. সি. আবদুল মহম্মদ, একজন রিটায়ার্ড ক্রিমিনোলজির এক্সপার্ট ডঃ ব্যানার্জি এবং ডক্টর পলাশ মিত্র, প্রখ্যাত মানসিক চিকিৎসাবিদ। রাঁচী উন্মাদ-আশ্রম থেকে তিনিও অবসর নিয়েছেন বছর তিনেক।

ডঃ ব্যানার্জি পত্র দুটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। ক্রিমিনাল ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে তিনি একমত। পত্র দুটি একই টাইপ-রাইটারে ছাপা এবং সম্ভবত একই ব্যক্তির ড্রাফ্‌ট্। তাঁর ধারণা লোকটা পাগলাটে—পাগল কিনা বলা কঠিন। তবে সে জীবনে ব্যর্থ। প্রতিষ্ঠা চায়। দ্বিতীয় খুনটা সে কাকে করতে যাচ্ছে তা না জানা পর্যন্ত তার সম্বন্ধে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

ডক্টর পলাশ মিত্রর সুচিন্তিত অভিমত: লোকটা 'মেগালোম্যানিয়াক্'—অর্থাৎ মনে করে যে সে এক দুর্লভ প্রতিভা। তার যা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল তা সে পায়নি। এই পথেই সে বিখ্যাত বা কুখ্যাত হতে চায়। তার পড়াশুনার রেজাল্টটা ভাল। ইংরাজী জ্ঞান টন্‌টনে, টাইপিঙের হাত খুব ভাল। কৌতুক বোধ প্রখর। 'পাগল' বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি তার আকৃতি মোটেই সে রকম নয়। পথেঘাটে দেখলে, বা আধঘণ্টা তার সঙ্গে খোশ গল্প করলেও হয়তো বোঝা যাবে না যে, সে পাগল। আরও বললেন, এ জাতীয় হত্যাবিলাসী বা 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'রা দু জাতের হয়ে থাকে। প্রথম জাতের হত্যা-বিলাসীরা বিশেষ এক জাতের মানুষকে খুন করে যায়—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ব্যবসায়ী, বিপরীত-লিঙ্গের মানুষ, স্কুল-টীচার ইত্যাদি। মনঃসমীক্ষণ করে দেখা গেছে তার পিছনে একটা-না-একটা অতীত ইতিহাস থাকেই। ঐ জগতের মানুষের কাছ থেকে অতীতে আঘাত পাওয়া। দ্বিতীয় জাতের হত্যাবিলাসী নির্বিচারে তার পথের বাধা সরিয়ে যায়। কোন দোকানদারের সঙ্গে কোন জিনিসের দর কষাকষি করতে করতে হয়তো তার গলা টিপে ধরে· ·

ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, কিন্তু অধরবাবুকে কোন একটা ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল—যে অস্ত্রটা আততায়ী লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং এটা পূর্বপরিকল্পিতভাবে…

ডক্টর মিত্র বাধা দিয়ে বলেন, আমি অ্যাকাডেমিক ভাবে ব্যাপারটা বলছি, স্পেসিফিক এ কেসটার কথা নয়। মানে, 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াকে'র মানসিক বিকৃতিটা কী জাতের হয়।

—ঠিক আছে, আপনি বলুন।

—বলার বিশেষ কিছু নেই। 'ক্লু' বলতে ঐ দুখানি চিঠি। দ্বিতীয় খুনটা··· আই মীন খুনের চেষ্টাটা হলে হয়তো পাগলটার চেহারা আর একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বাসু বলেন, আমার মনে একটাই প্রশ্ন! আপনি যে দু-জাতের হত্যাবিলাসীর কথা বললেন, আমাদের পাগলটা তো তাদের কোন দলেই পড়ছে না! বিশেষ এক জাতের মানুষকে যে সরিয়ে দিতে চায়, অথবা নিজের পথের বাধা সরিয়ে দেবার জন্য যে খুন করে, সে কি সে কথা এভাবে সকৌতুকে চিঠি লিখে ঘোষণা করতে পারে?

—আমি এমন কোনো কেস জানি না।

সারা রাত বেচারির ভাল করে ঘুম হয়নি। বারে বারে উঠেছে, জল খেয়েছে আর বাথরুমে গেছে। অথচ পাশের খাটে কৌশিক ভোঁস ভোঁস করে মোষের মতো ঘুমিয়েছে, টেরও পায়নি। অবশ্য দোষ তার নিজেরই— ভাবে সুজাতা। লাইব্রেরী থেকে একটা বিশ্রী বই নিয়ে এসে সন্ধ্যারাতে পড়তে শুরু করে ছিল। বিশ্রী বই মানে মনস্তত্ত্ব আর অপরাধ বিজ্ঞানের এক জগাখিচুড়ি গবেষণামূলক ইংরাজি বই। হত্যাবিলাসীদের মানসিকতা, কর্মপদ্ধতি, কেস-হিষ্ট্রি এবং কীভাবে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 'জ্যাক-দ্য-রীপারে' এর উপরেই বেয়াল্লিশ পাতা। এককালে লোকটা নাকি লণ্ডনে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ক্রমাগত সে মানুষ খুন করে যেত। হত্যাতেই তার আনন্দ। বাছবিচার নেই! কী বলবে? লোকটা পাগল? কিন্তু পাগল কি ঐ রকম শেয়ানা হয়? সমস্ত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কয়েক বছর ধরে হিম্‌সিম্ খেয়েছে তার হদিস পেতে। আর একটি অদ্ভুত কেস। এ ছোকরা আমেরিকান—তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল: জ্যাক-দ্য-রীপারের হত্যা-সংখ্যাকে অতিক্রম করা। বুড়ো-বাচ্চা, পুরুষ-স্ত্রী কোন বাছবিচার নেই। জ্যান্ত মানুষ হলেই হল। মায় জানলা দিয়ে ঢুকে হাসপাতালের বেডে ঘুমন্ত রোগীকে হত্যা করে এসেছে! যে রোগীকে সে জানে না, চেনে না, অন্ধকারে বুঝতেও পারেনি সে পুরুষ না স্ত্রীলোক। উদ্দেশ্য? বাঃ! রেকর্ড বেড়ে গেল না?

গ্রন্থকার এ-জাতীয় হত্যাবিলাসীদের মনোবিকলনের বিশ্লেষণ করেছেন। সাত-আটটি কেস-হিষ্ট্রি পড়ে সুজাতার মনে হল ওদের এই অজ্ঞাত হত্যাবিলাসীকে গ্রুপেই ফেলা যাচ্ছে না। সে যেন পরিচিত প্যাটার্নের নয়—সে অনন্য। প্রথম কথা, যে কটা কেস্ হিষ্ট্রি পড়ল তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আততায়ী সযত্নে নিজের

পরিচয় গোপন করেছে—সন্তর্পণে সব ক্লু মুছে দিয়ে গেছে। এ লোকটা তা করেনি। আসানসোলে দোকানের সান-মাইকা-টপ্ কাউন্টারে কোনো ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাওয়া যায়নি, এমনকি দোকানীরও নয়—তার একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত হত্যাকারী স্থানত্যাগের আগে রুমাল দিয়ে টেবিলটা মুছে দিয়ে গিয়েছিল। এই যার মানসিকতা সে কেন একই টাইপরাইটারে দু দুবার চিঠি লিখবে? সে কি জানে না যে, প্রতিটি টাইপরাইটারের ছাপা ফিঙ্গার-প্রিন্টের মতো সনাক্ত করা যায়—বিশেষজ্ঞের চোখে? তার মানে কি লোকটার দ্বৈতসত্তা? ডক্টর জ্যাকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড? এক সময়ে সে নিতান্ত ছেলেমানুষ, সুকুমার রায়ের বই থেকে 'ব্যাচারাথেরিয়াম্'-এর ছবি কেটে চিঠিতে সাঁটছে নিতান্ত কৌতুকবশে, অন্য সময়ে আস্তিনের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে গভীর রাত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোন একজন জ্যান্ত মানুষের সন্ধানে? না! তাও তো নয়! যার বাসস্থান, নাম/উপাধির আদ্য অক্ষর মিলে যাবে! কী করে সে খুঁজে বার করছে এমন অদ্ভুত কাকতালীয় যোগাযোগ? ওর মনে পড়ে গেল এক বান্ধবীর কথা—চুঁচুড়ার চন্দনা চ্যাটার্জির কথা। শিউরে উঠল সুজাতা। চন্দনার হাসিখুশি মুখটা মনে পড়ে গেল। বর্ধমানের পরে কি চুঁচুড়া?

ঠিক তখনি মনে হল সন্তর্পণে কে যেন দরজায় নক্ করছে। ধ্বাশ করে উঠল বুকের ভিতর! পরক্ষণেই মনে হল—এটা বর্ধমান নয়, নিউ আলিপুর; তার নামের আদ্যক্ষর বা উপাধি 'B' দিয়ে নয়! তবে কি ভুল শুনেছে? দরজায় কেউ ঠক্ ঠক্ করেনি? এ ওর অবচেতনের প্রতিক্রিয়া?

নাঃ! আবার কে যেন ঠক্ ঠক্ করল। সুজাতা বেড-সুইচটা জ্বালে। টেবিল ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে। রাত সাড়ে চারটে। নাইটি পরে শুয়েছিল সে। চাদরটা জড়িয়ে নিল গায়ে। কৌশিক এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। উঠে এসে দরজা খুলে দিল। প্যাসেজে আলোটা জ্বলছে। দাঁড়িয়ে আছেন বাসুমামু। পরনে গাউন, মুখে পাইপ। বললেন, কৌশিকের ঘুম ভাঙেনি?

—না। কী হয়েছে মামু?

—যা আশঙ্কা করা গেছিল! তুমি মুখে-চোখে জল দিয়ে নিচে নেমে এস। কৌশিককে ডাকার দরকার নেই!—সিঁড়ির দিকে ফিরে গেলেন বাসু-সাহেব।

'যা আশঙ্কা করা গেছিল'! অর্থাৎ বর্ধমানে এক হতভাগ্য কাল গভীর রাত্রে …সে যখন জ্যাক-দ্য-রীপারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড পড়ছিল? মৃত লোকটা কে?…পুরুষ? স্ত্রীলোক? আবার দোকানদার? এত—এত পুলিসের সতর্কতা সত্ত্বেও?

একটু পরে নিচে নেমে এসে দেখল বাসুসাহেব টেব্‌ল্-ল্যাম্পের আলোয় কী

একখানা চিঠি লিখছেন। সুজাতা নিঃশব্দে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। বাসু-সাহেব লক্ষ্য করলেন। কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরলেন, উপরে ঠিকানা লিখলেন। খামটা বন্ধ করলেন না। কাগজ-চাপার তলায় রেখে ঘুরে বসলেন সুজাতার মুখোমুখি। বললেন, বনানী ব্যানার্জি। বয়স সাতাশ-আটাশ। অবিবাহিতা। সুন্দরী। সময় রাত বারোটা থেকে দুটো। শ্বাসরোধ করে হত্যা। মার্ডারার কোন ক্লু রেখে যায়নি!

—এত তাড়াতাড়ি আপনি খবর পেলেন কেমন করে?

—আধঘণ্টা আগে বর্ধমান থেকে রবি ট্রাঙ্ক কল করেছিল।

—কিন্তু রবিবাবুই বা রাত ভোর হবার আগে কেমন করে জানলেন—কোন্ বাড়ির, কোন্ রুদ্ধদ্বার ঘরে একটা কুমারী মেয়েকে গলা টিপে মারা হয়েছে?

—না! মৃতদেহটা পাওয়া গেছে বর্ধমান স্টেশনে, টু ফিফ্‌টিন আপ বার্ডওয়ান লোকালের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে! শোন সুজাতা, আমি সকাল ছটা দশ-এর বর্ধমান-লোকালে ওখানে যাচ্ছি। এবার একাই। তোমাদের দুজনের কাজ এখানে, মানে কলকাতায়। এই চিঠিখানা ধর। মৃদুলকে আর্লি-আওয়ার্সে ধরবে। চিঠিখানা পড়লেই বুঝবে কী করতে হবে। সংক্ষেপে বনানীর পরিচয়টা দিই। খুব কিছু বিস্তারিত আমি জানি না। ইন্ ফ্যাক্ট, রবিও এখনো জানতে পারেনি। যেটুকু জানা গেছে তা এই:

বনানী ব্যানার্জির বাড়ি বর্ধমানে, কানাইনাটশাল পাড়ায়। ওরা দুই বোন, বাবা-মা জীবিত। বাবা রিটায়ার্ড রেলকর্মী! গার্ড, টিকিট-চেকার অথবা ডি.এস. অফিসের কেরানী ছিলেন। ছোট বোনটা কলেজে পড়ে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্ভবত বি. এ.। তার নাম জানি না। বনানী বড় বোন। ভাল অভিনয় করত। কলকাতার একটি গ্রুপ-থিয়েটারে—'কুশীলব'-এ হিরোয়িনের পার্ট। সাধারণত সপ্তাহে দুদিন—শনি রবি। প্রতি শুক্রবার কলকাতায় আসে, সোমবার ফিরে যায়। ও দুটো রাত ও কলকাতায় থাকে মাসীর বাড়ি, এক নম্বর ডোভার লেনে। সচরাচর বনানী সোমবার সকাল বা দুপুরের লোকাল ট্রেনে বর্ধমানে ফিরে যায়। কাল ওর কী দুর্মতি হয়েছে—মেইন-লাইনের টু-ফিফ্‌টিন আপ লোকালটা ধরে গিয়েছিল। সেটা বর্ধমানে পৌছায় রাত পৌনে দুটোয়। ওর ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ও একাই ছিল। গাড়ি ইয়ার্ডে নিয়ে যাবার আগে একজন যাত্রীর নজরে পড়ে।

সুজাতা বললে, এ তো অবিশ্বাস্য! রাত দুটোর সময় একটা অবিবাহিতা মেয়ে কেমন করে সাহস পায় একা একা বর্ধমান স্টেশান থেকে কানাইনাটশাল রিকশা করে যাবার? দ্বিতীয়ত আপনি যা বলছেন তাতে তো ফার্স্ট ক্লাসে ওর যাবার কথা নয়। বাপ রিটায়ার্ড কেরানী, নিজে কতই বা রোজগার করে?…

—তাই জানতেই যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যাতেই ফিরে আসব। রাণু ঘুমোচ্ছে, তাকে ডাকিনি। ঘুমোক। তোমরা সারাদিনে দেখ, এ দিককার কতটুকু খবর জানা যায়। মানে 'কুশীলব'-এর। মৃতুল, ছোকরা জার্নালিস্ট। বুদ্ধিমান, করিৎকর্মা। প্রেস কার্ড আছে। এ টিপ্‌স্‌টা পেয়ে ও খুশিই হবে। হয়তো পরের সংখ্যা 'সাপ্তাহিকে' মৃতুল একটা ঝাঁঝালো রিপোর্ট ঝাড়বে: 'বর্ধমানে ব্যর্থপ্রেমী বনানী ব্যানার্জির বিদায়!' তোমরা তুজন মৃতুলের সঙ্গে থাকবে। সন্দেহজনক সব কজনের ফটো নেবে…

—সন্দেহজনক মানে ?

—ঐ বয়সের একটি অভিনেত্রীর, যে একা-একা অতরাত্রে ট্রেন-ট্রাভ্‌ল্‌ করে, তার একটা রোমান্টিক অজ্ঞাত অধ্যায় থাকবার সম্ভাবনা। আর আমার তো বিশ্বাস—নাইন্টি-নাইন প্রার্সেণ্ট চান্স বনানী একা যাচ্ছিল না, তার কোন পুরুষ সঙ্গী ছিল। যে লোকটা কেটে পড়েছে। সম্ভবত সে-ই আততায়ী।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে বটে!

—সে-ক্ষেত্রে লোকটা 'কুশীলব'-এর কোন কুশীলব হওয়াই সম্ভব। এবার বুঝলে ? 'সন্দেহজনক' শব্দটার অর্থ ?

সুজাতা সলজ্জে ঘাড় নাড়ে।

—ও হ্যাঁ। ঐ সঙ্গে ডোভার লেনেও একবার ঢুঁ মেরো। ওর মেসোর নাম এস. রায়!

বাসুসাহেব্‌ বাথরুমে ঢুকে গেলেন। এখনো তাঁর প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়নি।

সুজাতা চট করে রান্নাঘরে চলে যায়। মামুর জন্য ঝটপট্‌ করে একটা ব্রেক-ফাস্ট বানাতে।

চার

সকাল নটার মধ্যেই বাসুসাহেব বর্ধমান সদর থানায় উপস্থিত হলেন। মৃতদেহ তার পূর্বেই সদর হাসপাতালে অপসারিত হয়েছে। পোস্ট মর্টেম হয়নি। তবে পুলিসের অভিজ্ঞ চোখে মৃত্যুর কারণটা স্পষ্ট—ওর গলার তুদিকে পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের স্পষ্ট দাগ : শ্বাসরোধ করে হত্যা।

বর্ধমান থানার ও. সি. আবতুল সাহেব এবং রবি বোস ইতিমধ্যে প্রাথমিক তদন্ত পর্যায়টা শেষ করেছে। গতকাল সারা বর্ধমানে প্লেন-ড্রেস পুলিসে ছেয়ে রাখা হয়েছিল। লোকাল টেলিফোন গাইডে 'B' অক্ষর দিয়ে যে কটা উপাধি আছে প্রত্যেকটি বাড়িতে টেলিফোন করে আবতুল সাহেবের সহকর্মী একটা

রহস্যময় বার্তা জানিয়েছেন : 'থানা থেকে বলছি। আপনাদের বাড়িতে আজ একটা হামলা হওয়ার গোপন 'টিপ্‌স' আমরা পেয়েছি। কথাটা জানাজানি করবেন না। পুলিসে নজর রাখছে। আপনারা নিজেরাও একটু সাবধান থাকবেন। বেশি রাত পর্যন্ত বাড়ির কেউ বাইরে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানান জাতের প্রতিপ্রশ্ন হয়েছে—কী জাতের হামলা? ডাকাতি? পলিটিক্যাল? কোন সূত্রে জেনেছেন আপনারা?

প্রতিক্ষেত্রেই একই জবাব : আতঙ্কগ্রস্ত হবার দরকার নেই। পরিবারস্থ মানুষজনের বাইরে কাউকে কিছু বলবেন না। ঝি-চাকরদেরও নয়। এর বেশি কিছু আপাতত বলতে পারছি না। আজ রাতটা কেটে গেলে বুঝবেন 'টিপ্‌সটা' ভুল ছিল।

কেউ কেউ অতি-সাবধানী একটু পরে রিং ব্যাক করে জেনে নিয়েছিলেন —থানা থেকে সত্যিই একটু আগে ফোন করা হয়েছিল কি না।

যতই গোপন করার চেষ্টা হোক খবরটা গোপনে পাব্‌লিসিটি পায়। সারা শহরে একটা চাপা উত্তেজনা। কী—কেন—কার বরাতে ঘটতে যাচ্ছে তা কেউ জানত না—কিন্তু জীপের আনাগোনা কেন হঠাৎ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে এটাও শহরের মানুষের নজর এড়ায়নি। লোড-শেডিং হয়নি—উপর মহল থেকে কঠিন সতর্কবাণী এসেছিল, সাতাশে রাত্রে যেন গোটা বর্ধমান এলাকায় একেবারে লোড-শেডিং না হয়। প্রয়োজনে আর সব কটা সার্কিট বন্ধ করেও।

মৃতদেহ যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম মনীশ সেন রায়। অ্যাণ্ড্রু ইউলের অফিসার। ব্যাচেলার। বয়স পঁয়ত্রিশ। বর্ধমান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। ফার্স্ট ক্লাস মান্থলি আছে। বনানীকে চেনেন—ব্যক্তিগতভাবে নয়, বর্ধমানের একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী হিসাবে। তাঁর জবানবন্দির সংক্ষিপ্তসার এই রকম :

সচরাচর সেন রায় সাহেব সন্ধ্যা ছ'টা দশের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ধরে রাত আটটার মধ্যে বর্ধমানে পৌঁছে যান। পূর্বরাত্রে, অর্থাৎ সাতাশে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছিল কলকাতায়। তাই বাধ্য হয়ে মেন-লাইনের শেষ বর্ধমান লোকালটা ধরে ফিরছিলেন। প্রথম যে ফার্স্ট ক্লাস কামরাটায় ঢোকেন তার নিচের দুটি বেঞ্চিতেই চাদর পাতা। একটিতে একজন লোক শুয়ে ছিল আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে। বিপরীত বেঞ্চিতে জানলার ধারে একা বসেছিল বনানী। তার পরনে হালকা নীল রঙের একটা মুর্শিদাবাদী, গায়ে ঐ রঙেরই ব্লাউস। উপরের বার্থ দুটি খালি। সেন রায়ের সঙ্গে বনানীর চোখাচোখি হয়। বনানী ওঁকে না চিনবার ভান করে। সম্ভবত বনানী ওঁকে চিনত না—বর্ধমানের একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার বলে হয়তো সনাক্ত করতে পারত। অথচ উনি জানতেন, বনানী

অভিনেত্রী, এবং তার অনেক পুরুষ 'ফ্যান' আছে। বনানীর দৃষ্টিতে একটা বিরক্তির ভঙ্গি লক্ষ্য করে উনি বুঝতে পারেন,—চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া সহযাত্রীটি ওর 'নাগর'! তাই উনি পাশের কামরায় গিয়ে বসেন। বনানীর সহযাত্রীটিকে উনি দেখেননি ; কিন্তু তার পায়ে ফিতেবাঁধা পুরুষদের জুতোটা চাদরের বাইরে বার হয়ে ছিল। তাতেই উনি আন্দাজ করতে পারেন যে, সে লোকটা পুরুষ।

ট্রেন যখন ব্যাণ্ডেল ছাড়ে—রাত বারোটা নাগাদ—তখন উনি একবার বাথরুমে যান। লক্ষ্য করে দেখেন, ঐ কামরার দরজাটা টানা। ভেতর থেকে বন্ধ কিনা তা জানতেন না অবশ্য। পরীক্ষা করে দেখেননি।

মনীশবাবুর অভিজ্ঞতায় বর্ধমান লোকালের শতকরা নব্বই ভাগ যাত্রী বর্ধমানের আগেই নেমে পড়ে। গভীর রাতের ট্রেন হলে শেষপ্রান্তের যাত্রীরা ঠাঁই বদল করে এক কামরায় এসে জোটেন, ছিনতাই-পার্টির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের জন্য। এমনকি ফার্স্ট ক্লাস নির্জন হয়ে গেলে সেকেণ্ড ক্লাসেও চলে আসেন। ওঁর কামরায় শেষ প্যাসেঞ্জারটি শক্তিগড়ে নেমে গেলে উনি কামরা বদলে এ ঘরে চলে এলেন। দেখলেন, দরজাটা তখনও বন্ধ। কৌতূহল বশে পাল্লাটা ধরে টানতেই সেটা খুলে গেল। উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বনানী একা নিচের বেঞ্চেই লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। কামরায় দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই। বনানী উল্টো দিকে মুখ করে ঘুমোচ্ছিল। মনীশবাবু রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান। ঐ বয়সের একটি মেয়ে দরজা খোলা রেখে এমন অরক্ষিত কামরায় এত রাত্রে এভাবে ঘুমোয় কি করে! যাই হোক ট্রেন গাংপুর স্টেশান পার হলে তিনি বারকয়েক ওকে নাম ধরে ডাকলেন। ওর নাম যে 'মিস্ বনার্জি' তা জানা ছিল মনীশের। মেয়েটি সাড়া দিল না। তখন বাধ্য হয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন ও অজ্ঞান হয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে না। ট্রেন থামতেই উনি ছুটে গিয়ে গার্ডকে ডেকে আনেন। তখন বোঝা যায়—বনানী অজ্ঞান নয়, মৃত!

ব্যাপারটা ঘোরালো। অত্যন্ত ঘোরালো—যদি মনীশ সেন রায় আদ্যন্ত সত্য কথা না বলে থাকে।

ও. সি. ওঁকে সে-কথা বেশ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, মিস্টার সেন রায়, বুঝতেই পারছেন পুলিস-অফিসার হিসাবে আমাকে এটুকু করতেই হবে। আপনার স্টেটমেণ্ট অনুসারে আপনি সাধারণ নাগরিকের কর্তব্যই করেছেন, কিন্তু আপনার স্টেটমেণ্ট করোবরেট করবার কোন উপায় নেই। একটি নির্জন রেল কামরায় ছিলেন আপনারা মাত্র দুজন। আপনি আর মৃত বনানী।

মনীশ সেন রায় রুখে উঠেছিল, আপনি কি সন্দেহ করছেন—আমি খুন করেছি?

—না। কারণ তা করলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতাম। তা করছি না। কিন্তু 'বর্ধমান-কলকাতা' ছাড়া আপনি এক সপ্তাহ আর কোথাও যাবেন না। গেলে থানাকে জানিয়ে যাবেন। আপনি অফিস-বাড়ি যেমন করছেন তেমনিই করবেন। শুধু আজকের দিনটা ছুটি নিন। কলকাতা থেকে হায়ার-অফিসাররা এন্‌কোয়ারিতে আসবেন।

—কিন্তু আমার যে সকাল এগারোটায় অফিসে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—আপনি আপনার 'বস'-এর নাম আর টেলিফোন নাম্বারটা দিন, আমি টেলিফোনে তাঁকে জানিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ! সেটুকু আমিই করতে পারব। শুধু আজকের দিনটাই তো?

—হ্যাঁ। আয়াম সরি ফর দ্য ট্রাব্‌ল্‌।

—না! আপনার দুঃখিত হবার কী আছে? আমারই ভুল! গার্ডকে না ডেকে আমার নিঃশব্দে কেটে পড়া উচিত ছিল।

আবদুল মহম্মদ হেসে বলেছিলেন, সেটাই ভুল হত আপনার। কারণ তাহলে এতক্ষণে আপনি থাকতেন আমার লক্‌-আপে।

বনানীর বাবা, মা অথবা ছোট বোন ময়ূরাক্ষীর জবানবন্দি এখনো নেওয়া যায়নি। মানে, তাদের মানসিক অবস্থা বিচার করে। তবে ওদের প্রতিবেশীদের জবানবন্দি থেকে বোঝা গেছে, বনানী চিরকালই একটু ডাকাবুকো ধরনের। অতরাত্রে না হলেও বেশ রাত করে সে অনেকবার কলকাতা থেকে একা একাই ফিরে এসেছে। থিয়েটারে প্রতিরাত্রে ও দেড়শো টাকা করে পেত, তা ছাড়া যাতায়াত খরচ। অর্থাৎ মাসে প্রায় হাজার টাকা রোজগার করত। সুন্দরী, গ্ল্যামারাস, অভিনেত্রী। বদনাম কিছুটা থাকবেই। জনশ্রুতি সে নাকি সিনেমায় নামবার একটা চান্স পেয়েছিল। ভয়েস-টেস্টিং পর্যন্ত হয়ে গেছে। ফলাফল জানা যায়নি।

বাসুসাহেব বাধা দিয়ে বলেন, বাপ-মা-বোন কাউকেই জেরা করনি তোমরা, তাহলে এত খবর পেলে কার কাছে?

—অমল দত্ত। বনার্জি মহাশয়ের নেক্সট-ডোর নেবার। সদ্যপাস ইলেকট্রি-ক্যাল এঞ্জিনিয়ার। ও পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা। ব্যাচিলার, কলকাতায় ফিলিপ্স্‌-এ কাজ করে।

—হুঁ! তার মূল টার্গেটটা কী? রিভার না ফরেস্ট?

—আজ্ঞে?

—সদ্যপাস ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার একটি সুপাত্র। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার মূল প্রেরণাটা কোথায় ছিল? বনানী, না ময়ূরাক্ষী?

রবি হেসে বলে, আমার ধারণা : বনানী। না হলে এভাবে ভেঙে পড়ত না।

—আর ওঁদের উপাধিটা কী ? বনার্জি না ব্যানার্জি ?

—ঐ একই কথা। বনানীর বাবা একটা 'জিনিওলজিক্যাল ট্রি'-র মাধ্যমে হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে, তিনি স্বনামধন্য ডব্লু. সি. বনার্জির বংশধর। তাই যদিও ওঁর বাবা ছিলেন ব্যানার্জি, উনি নিজের নাম লেখেন 'বনার্জি'।

—বুঝলাম। তুমি ঐ দুজনের সঙ্গেই আমার ইন্টারভিয়ুর ব্যবস্থা করে দাও। মনীশ আর অলয় দত্ত। আর পোস্ট-মর্টাম রিপোর্টটা এলে তার একটা কপি।

আবদুল মহম্মদ বললে, ও রিপোর্টে নতুন করে জানবার কিছু নেই স্যার।

—য়ু থিংক সো ? আমি জানতে চাই—বনানী হেভি ডোজ-এর কোনও ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল কিনা, ওর স্টম্যাকে ভুক্তাবশিষ্ট কী কী পাওয়া গেছে, আহারের কতক্ষণ পর মৃত্যু হয়েছে এবং ওর দাঁতের ফাঁকে পান সুপুরির কুচি ছিল কিনা।

রবি সোম চোখ টিপে ওর সহকর্মীকে বারণ করল। আবদুল আর কিছু প্রশ্ন করল না।

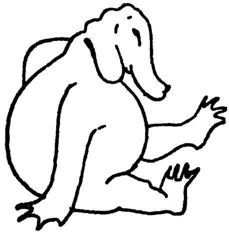

মনীশ সেনরায় থানাতে জবানবন্দি দিতে এল রীতিমতো উদ্ধত ভঙ্গিতে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে একটু থমকে গেল। বাসুসাহেব তখন একমনে পাইপে তামাক ভরছিলেন, চমকটা তিনি লক্ষ্য করেননি। বললেন, প্লীজ টেক য়োর সীট মিস্টার সেনরায়। শুনুন মশাই, আমি পুলিসের লোক নই…

বাধা দিয়ে সেনরায় বলে, জানি স্যার! আপনাকে আমি চিনি। ইন্ ফ্যাক্ট, আপনার কথাই এতক্ষণ ভাবতে ভাবতে আসছিলাম ··

—আমার কথা! হঠাৎ আমার কথা কেন ?

—এই মাথামোটা পুলিসগুলো নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে কেস্ সাজাবে। তখন আপনাকে আমার প্রয়োজন হবে—ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে। তাই।

—আই সী! না, মনীশবাবু! নাইন্টিনাইন-পয়েন্ট-নাইন পার্সেন্ট চান্স তোমার বিরুদ্ধে পুলিস কেস সাজাবে না। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি—তুমি টু হাণ্ড্রেড-পার্সেন্ট নট-গিল্টি। আমরা যাকে খুঁজছি সে একটা 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক'! আধা পাগল! অ্যাণ্ড ইউলের অফিসার সে হতে পারে না।

—হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক! কী করে জানলেন?

—সম্ভবত কাল-পরশুর মধ্যেই খবরের কাগজে তার বিস্তারিত বিবরণ পাবে। এখন তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব তার সত্য জবাব দিও। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আদালতে এসব প্রশ্ন উঠবে না। তা তুমি আসামীই হও অথবা সরকারপক্ষের সাক্ষীই হও। তুমি কি আমাকে আত্যন্ত সত্য জবাব দেবে? খুনী লোকটাকে ধরতে সাহায্য করবে?

—বলুন স্যার? আমি ওয়ার্ড-অব্-অনার দিচ্ছি।

—বনানীর প্রতি কি তোমার কোনও সফ্ট-কর্ণার ছিল? রোমান্টিক্যালি অথবা সেক্শুয়ালি?

প্রশ্ন শুনে মনীশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। নড়েচড়ে বললে, ছিল স্যার। বনানী গ্ল্যামারাস মেয়ে, তার সেক্স্-অ্যাপীল ছিল। স্টেজে এবং ট্রেনে তাকে বারে-বারে দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ ছিল না। কোন দিন কথাবার্তা হয়নি।

—তুমি কি জান তার কোনও ল্যাভার ছিল?

—সঠিক জানি না। আন্দাজ করেছি এবং লোকমুখে শুনেছি সে কন্জার-ভেটিভ্ ছিল না।

—মীনিং…পয়সা খরচ করতে রাজী হলে সে লিবারাল হলেও হতে পারত।

নতনেত্রে মনীশ বললে, হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

—তুমি নিজে কখনো চেষ্টা করেছিলে?

—না, করিনি। আমার মানসিক গঠন সে জাতের নয়। তার সঙ্গে আমার যে আলাপই ছিল না।

—ও কি একা-একা যাতায়াত করত? কখনো কোন এস্কর্ট তোমার নজরে পড়েনি?

—অন্ দ্য কন্ট্রারি ওর সঙ্গে বরাবরই একজন থাকত। ওরই প্রতিবেশী। নামটা ঠিক জানি না। ফিলিপ্স্-এর এঞ্জিনিয়ার।

—ওর অভিনয় তুমি দেখনি?

—বহুবার।

—'কুশীলব'-এ কি ওর কোনও প্রেমিক ছিল?

—আমি ঠিক জানি না, স্যার।

—ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্তই। আরে মনে হচ্ছে তোমাকে আবার আমার প্রয়োজন হবে। সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

অমল দত্ত থানাতে জবানবন্দি দিতে এল ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে।

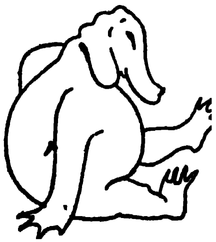

চুলগুলোই শুধু অবিন্যস্তই নয়, বুশ-শার্টের বোতামগুলো এক এক-ঘর ভুল ফুটোয় ঢোকানো। তার মুখে নিদারুণ বেদনা, হতাশা আর বিরক্তি। রবি বোস বলল, বসুন অমলবাবু।

অমল সে কথায় কান দিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, আপনারা আর ক-দফা জবানবন্দি নেবেন বলুন তো মশাই?

ও. সি. বলেন, ক্ষুব্ধ হবেন না অমলবাবু। আমাদের উদ্দেশ্যটা তো বুঝছেন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন···

—অ! তা প্রশ্ন করুন। কী জানতে চান?

বাসু মনে মনে একটা ওকালতি লব্‌জ উচ্চারণ করলেন: 'হোস্টাইল উইট-নেস্'! মুখে বললেন, কাল রাত দুটো নাগাদ আপনি কোথায় ছিলেন অমলবাবু?

—টু ফিফটিন-আপ বর্ধমান লোকালের ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। কেন?

রবি এবং আবদুল যেন শক্ খেয়েছে। সোজা হয়ে বসে দুজনেই।

বাসু নির্বিকারভাবে বলেন, আই সী! যে কামরায় বনানী ছিল?

—না হলে তাকে হত্যা করব কী করে? আমিই তো গলা টিপে তাকে মেরেছি। কেন, জানেন না? এঁরা তো সকলেই জানেন।

আবদুল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রবিও সরে গেছে ওর কাছাকাছি। একটা হাত তার পকেটে। বাসুসাহেব কিন্তু এখনো নির্বিকার। বললেন, ফর য়োর ইনফরমেশান, মিস্টার দত্ত। আমি পুলিসের কেউ নই।

—অ!—এতক্ষণে অমল দত্ত বসে পড়ে চেয়ারে। বলে, আপনি তাহলে কে?

-আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। পুলিসে যখন আততায়ীকে ধরবার চেষ্টা করে তখন মিথ্যা কথা বলি না। যতই ক্ষুব্ধ হই, যতই মানসিক আঘাত পাই। আপাতত এটুকুই আমার পরিচয়।

অমল এবার ওঁকে ভাল করে দেখে বললে, আয়াম সরি, স্যার! আপনি পি. কে. বাসু। কাগজে আপনার ছবি দেখেছি। কী জানেন স্যার, সকাল থেকে এঁরা আমায় জেরবার করে দিচ্ছেন। যেন মানুষের ব্যক্তিগত সেন্টিমেণ্ট বলে কিছু থাকতে নেই·· আমার একমাত্র অপরাধ আমি বনানীকে ভালবাসতাম।

—আই সী! এখন কি শান্তভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে? না, আমি পরে তোমাকে ডেকে পাঠাব? তোমার মানসিক ভারসাম্য ফিরে এলে?

—আয়াম এক্সট্রিমলি সরি স্যার ! না, না, আমি ঠিক আছি। কাল আমি ঠিক ওর আগের দশটা পঞ্চান্নর কর্ড লাইনের লোকালটায় বর্ধমানে ফিরে আসি। রাত দুটোয় আমি বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম।

—তুমি কি বনানীকে তোমার মনোভাব কখনো জানিয়েছিলে ?

অমল পুলিস-অফিসার দুজনের দিকে দেখে নিয়ে বললে, এঁদের সামনে আমি সেসব কথা বলব না স্যার। আপনি যদি জনান্তিকে জানতে চান এবং এসব কথা খবরের কাগজে ছাপা হবে না গ্যারাণ্টি দেন···

বাসু-সাহেব পুলিস-পুঙ্গবদ্বয়ের দিকে ফিরে বলেন, তোমরা কী বল ?

আবদুল কিছু বলার আগেই রবি বলে ওঠে, থানার ভিতর সেটা অনুমোদন-যোগ্য নয়। তবে জীপ রেডি আছে। আপনি মিস্টার দত্তকে নিয়ে রেস্ট হাউসে চলে যান। সেখানে উনি যা বলবেন তা উকিলকে বলা 'প্রিভিলেজড্ কনফেশন'। আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।

বাসু-সাহেব খুশি হলেন রবির উপস্থিত বুদ্ধি দেখে। উপযুক্ত সহকর্মী বেছে নিয়েছেন তিনি। রবি ভালোভাবেই জানে—অমল দত্ত বাসু-সাহেবের মক্কেল নয়, সে যা বলবে তা আদৌ 'প্রিভিলেজড্ কনফেশান' নয়, কিন্তু এভাবেই অমলের আত্মম্ভরিতা বা 'এগো' চরিতার্থ হবে। এভাবেই তার কাছ থেকে ভিতরের কথা বার করা যাবে।

রেস্ট-হাউসে দু'কাপ কফি নিয়ে বাসু-সাহেব অমল দত্তের এজাহারটা শুনলেন।

হ্যাঁ, অমল দত্ত বনানীকে ভালবাসে, মানে, বাসত। সে কথা সে তাকে বহুবার বলেছে। বনানী সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দিত। তার মনোভাবটা বোঝা যায়নি কোনদিন। কখনো বলেছে, 'বিয়ের পর তো তুমি আমাকে খাঁচার ময়না করে রাখবে, থিয়েটার করতে দেবে না', কখনো বলেছে, 'আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ, তুমি বাতি নেভাও, আর আমি বাতি জ্বালি।' অমল হয়তো সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছে—'তার মানে ?' আর বনানী খিলখিল করে হেসে বলেছে—'আমি স্টেজে ঢুকলে স্পট লাইট আমার মুখে পড়ে, দেখনি ? আর তুমি ? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার—যার একমাত্র কাজ লোড-শেডিং-এর এন্তাজাম করা !'

মোট কথা, বনানীর মনোভাবটা বোঝা যায়নি। তবে অমলকে সে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিত। অমল বর্ধমানে ওর প্রতিবেশী। ওরা প্রায়ই এক ট্রেনে যাতায়াত করত। একসঙ্গে কলকাতায় ঘোরাঘুরি করত।

বাসু-সাহেবের মনে হল—বনানী যে অমলকে নিয়ে খেলা করত তার দুটো উদ্দেশ্য। প্রথমটা হচ্ছে স্বভাবগত—পুরুষমানুষকে নিয়ে খেলা করার তার

আমোদ, দ্বিতীয়টা আত্মরক্ষার্থে—অবাঞ্ছনীয় পুরুষমানুষকে দূরে হটাতে। অমল ছিল বনানীর 'গ্লোরিফায়েড এস্কর্ট'—রাঙতার সাজপরা দেহরক্ষী।

অমল জানালো, বনানীর একাধিক পুরুষবন্ধু ছিল। ওর ধারণা, এটা বনানীর স্বভাব। ওর আরও ধারণা, এই আপাত 'বেলেল্লাপনা' একেবারে উপরকার জিনিস। অন্তরে মেয়েটা ছিল দারুণ 'পিউরিটান'—অমলকে সে কোনদিন চুমু পর্যন্ত খেতে দেয়নি।

মাসখানেক হল বনানী নাকি একজন বড়লোক কাপ্তেন ফিল্ম-প্রডিউসারের খপ্পরে পড়েছিল। অমল কখনো তাকে দেখেনি। তবে এটুকু জানে, লোকটা বিবাহিত আর বনানীর পিছনে দেদার খরচ করত। সে নাকি ওকে সিনেমায় নামিয়ে দেবার সুযোগ দিতে চাইছিল।

বাসু-সাহেব অনেক জেরা করেও সেই অজ্ঞাত কাপ্তেনবাবু সম্বন্ধে কোন তথ্যই সংগ্রহ করতে পারলেন না।

অমলও ওঁকে শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করল—বনানীকে যে এভাবে হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বার কবতে সে সব রকম সাহায্য করতেই প্রস্তুত।

বাসু-সাহেব তাকেও কথা দিয়ে এলেন, সময় হলে তোমাকে ডাকব।

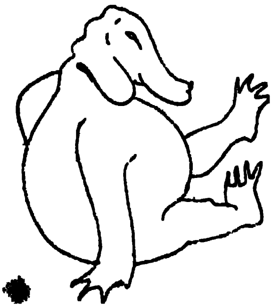

মৃদুল 'শনিবারের চিঠি'র জন্য একটা 'স্টোরি' পেল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সুজাতা একটি মজাদার মেয়ের সন্ধান পেল। তার কণ্ঠটি সোনা দিয়ে বাঁধানো—কী গানে, কী বাকচাতুরীতে। 'কুশীলব'-এর সবাই এবং ডোভার রোড-এর সকলেই মর্মাহত। কথা বলার মত মন্-মেজাজ নেই কারও। সবাই মুষড়ে পড়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ ঊষা বাগচী। স্থূলাঙ্গী এবং কুদর্শনা। কিছুটা ভগবান মেরে রেখেছেন, কিছুটা বা তার ভোজনপ্রিয়তা। তবু 'কুশীলব'-এ তার ডাক পড়ে। কারণ ঊষা বাগচী মধুকণ্ঠী। ফরমাসী নাটক যখন লেখানো হয় তখন অন্তত এক সীনের অ্যাপিয়ারেন্সে ভিক্ষুণী বা বৈরাগিণী বেশে ঊষা একখানি গান গেয়ে যায়—নাটক মুহূর্তে 'পয়োধি'! ওর সঙ্গে আলাপ করে সুজাতা বুঝতে পারে একমাত্র এই মেয়েটাই অতটা মুষড়ে পড়েনি। কিছুটা স্বভাবগত কৌতুকপ্রিয়তায়, কিছুটা বা ঈর্ষায়! জনান্তিক আলাপে সুজাতাকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, কী বলব ভাই—অমন মৃত্যু যেন শত্রুরও না হয়, কিন্তু একথাও বলব—ওজাতের মেয়ে এভাবেই পটলোত্তোলন করে!

—ও জাতের মেয়ে মানে? —সুজাতা মেয়েলী কৌতুহল দেখায়।

—দিনরাত যে মেয়ে গুন্‌গুন্ করে : 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে ?

—ওর বুঝি অনেক পুরুষ 'ফ্যান' ছিল ?

—তা যদি বলেন, তা হলে বলব—'ফ্যান' বস্তুটা হচ্ছে 'নেসেসারি ইভল', শিল্পীর কাছে। আচার্য পি. সি. রায়ও তাই বলতেন—কিছুটা 'ফ্যান' হজম করা ভাল। তাই বলে কি গাঁৎ গাঁৎ করে শুধু 'ফ্যান'ই গিলতে হবে ? ফ্যানটা গেলে ফেলে ঝরঝরে ভাত খেতে হবে না ? নিজের ঝকঝকে ঘর, নিজের তক্‌তকে বর, নিজের বক্‌বকে বাচ্চা ?

সুজাতা হেসে বলে, শিল্পীর পক্ষে 'ফ্যান'টা বুঝি 'নেসেসারি ইভল' ?

—নয় ? এই আমাকেই দেখুন না। কালো-মোটা ! তাই বলে কি 'উষা-ফ্যানে'র নাম কেউ শোনেনি ? কিন্তু আমার কথা হচ্ছে—নিজের মান নিজের কাছে। চেনা নেই, অচেনা নেই, যে কেউ এসে পটাস্ করে ফ্যানের বোতাম টিপল আর অমনি বাঁই বাঁই পাক খেতে হবে ?

সুজাতা সায় দেয়—বটেই তো। বনানীর বুঝি অনেক 'ল্যভার' ছিল ?

—তা ছিল। বৃন্দাবনেব কনভার্স থিয়োরেম। ষোড়শ গোপ ! থিয়েটার শেষ হলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে ওঁকে ডোভার লেন তক্ এস্‌কর্ট করে নিয়ে যাবে !

—আপনি তাদের সবাইকে চেনেন ?

—কিছু মনে করবেন না ভাই—এটা আপনার বোকার মত প্রশ্ন হল ! ষোড়শ গোপকে কি চিনে রাখা সম্ভব ? বনানী নিজেই চিনতে পারত না। তবে হ্যাঁ—'হ্যাণ্ডসাম, স্মার্ট, টল, ফেয়ার' এমন কয়েকটি বংশীবাদককে ভুলতে পারিনি। ভোলা শক্ত।

—বংশীবাদক ? আপনার গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাতেন বুঝি ?

—আপনি ছেলেমানুষ অথবা অন্ধ ! আমার খানদানী বদনখানা দেখছেন না ? বংশী অর্থে এখানে 'হর্ণ' বা 'হুটার' ! 'শো' শেষ হলেই সমস্বরে ওঁরা বংশীধ্বনি করে 'ধনিকে' ডাকতেন।

এর পরেই থিয়েটারের ম্যানেজার আর কৌশিক ওদের দিকে এগিয়ে আসে। ওদের রসসিক্ত নিভৃত কূজন বন্ধ করতে হল।

পাঁচ

পয়লা নভেম্বর বিজন স্ট্রীটের বাড়ীতে একটা বিশ্রি দুর্ঘটনা ঘটল।

বেলা তখন আটটা। চিলে-কোঠার ঘর থেকে নিচে নেমে দোতলার ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাই হাঁকাড় পাড়লেন, বৌমা ?

দোতলায় ওঁরা তিনজনে প্রাতরাশে বসেছিলেন। প্রমীলা এসে বললেন মাস্টারমশাই? আসুন ভিতরে আসুন।

—না বৌমা, ভিতরে যাব না। তোমার সারা মেঝে নোংরা হয়ে যাবে। এমনিতেই এই দেখনা…হাতটা বিশ্রিভাবে কেটে গেল‥ ইয়ে, দাশু আছে? একটা ব্যাণ্ডেজ…

ডান হাতখানা তিনি বাড়িয়ে ধরলেন। ডান হাতের তালু দিয়ে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে। ওঁর ধুতি, জামার আস্তিন রক্তে মাখামাখি!

—ঈস! কি-করে এমন হল!‥ ওগো…শিগ্গির এস…

ডক্টর দে চায়ের কাপটা নামিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। দেখেই বললেন মৌ! আমার ডাক্তারী ব্যাগটা—কুইক্!

প্রাথমিক চিকিৎসা যা করার তৎক্ষণাৎ করা হল। হাতের তালুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল। ডক্টর দে ওঁকে জোর করে একটা খাটে শুইয়ে দিলেন। একটু গরম দুধও খাইয়ে দিলেন স-ব্র্যাণ্ড। বললেন, এভাবে হাত কাটলেন কি করে?

—পেন্সিল ছুলতে গিয়ে।

—আপনি নিজে নিজে আর পেন্সিল কাটবেন না। মৌকে বলবেন, আর না হলে ঐ যে ঘোরানো পেন্সিল-কাটা কল পাওয়া যায় তাই দিয়ে কাটবেন।

মাস্টারমশাই হেসে বললেন, আর দাড়ি? শেভ্ করে দেবে কে? তুই?

ঠিকে ঝিকে প্রমীলা বললেন, তিনতলার ঘরটা মুছে দিয়ে আয় তো কুসমির মা! ঝি বাসন মাজছিল, বললে, দোব মা, হাতটো অপ্সর হোক্ পহিলে।

প্রমীলার মনে হল হয়তো চিলে-কোঠার ঘরখানা খোলা রেখেই মাস্টারমশাই নিচে নেমে এসেছেন। সে ঘরের একটি ডুপ্লিকেট চাবি ওঁর কাছে বরাবরই থাকে। ঘরে আর কিছু না থাক একটা দামী টাইপ-রাইটার আছে। তাছাড়া রক্তারক্তি কাণ্ড কতটা হয়েছে দেখতে প্রমীলা নিজেই চাবিটা হাতে নিয়ে তিনতলায় উঠে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

সিঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা ধারা শেষ হয়েছে ওঁর টেবিলে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, মাস্টারমশায়ের ছড়ানো পাণ্ডুলিপির পাশেই টেবিলের উপর পড়ে আছে একটা বাঁধানো ফটো। চিনতে পারলেন সেটা। এটা বহুদিন আছে ওঘরে। মাস্টারমশায়ের নয়। একজন স্বনামধন্য পুরুষের। গুরুগিরি তাঁর ব্যবসা। অনেক শিষ্য আছে তাঁর। প্রতি বৎসর জন্মোৎসবে খবরের কাগজে তাঁর নাম, ফটো আর আশীর্বাণী ছাপা হয়। ভক্তদের খরচে। সম্প্রতি একটি নারীঘটিত ব্যাপারে ঐ প্রৌঢ় গুরুজীর নামে কিছু কেচ্ছা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। বিধবার সম্পত্তি গ্রাস অথবা শ্লীলতাহানী কি-যেন

ব্যাপারটা ! দাশরথী এঁর শিষ্য নন, গুণগ্রাহীও নন। তাঁর কোনও রুগী রোগমুক্ত হবার পর ফটোখানি ডাক্তারবাবুকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, এটা শোবার ঘরে মাথার কাছে টাঙিয়ে রাখবেন ডাক্তারবাবু। 'বাবা'র আশীর্বাদ তাহলে নিত্য পাবেন। ডক্টর দে স্নেহের দানটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'শোবার ঘরে এঁকে রাখা যাবে না। মাথার দিকে রাখলে রোজ ঘুম ভেঙে শ্রীমুখখানি দেখতে পাব না, পায়ের দিকে রাখলে তা পাব—কিন্তু তাহলে 'বাবা'র আশীর্বাদের বদলে হয়তো অভিশাপটাই জুটবে কপালে।' প্রমীলা জানতেন, তাঁর স্বামী এসব গুরুবাদে বিশ্বাসী নন। ছবিখানি তাই দীর্ঘদিন চিলেকোটার ঘরে হুক থেকে ঝুলছিল।

বর্তমানে দেখলেন, ফটোর কাচটা চুরমার হয়ে ঘরময় ছড়ানো। আর একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি ছবিটার উপর এত জোরে মারা হয়েছে যে, ছবি ও ফ্রেম ভেদ করে ছুরির ফলাটা টেবিলে গেঁথে আছে !!

প্রমীলা ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলেন। ছুরিটা সাবধানে উপড়ে নিলেন এবং একটি পুরানো খবরের কাগজে সব কিছু জড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে সন্তর্পণে নিচে নেমে এলেন। লুকিয়ে ফেললেন সব কিছু।

একটু পরে ঝি এসে ঘরটা ভিজে-ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিয়ে গেল।

মৌ দুপুরে কলেজে বেরিয়ে যাবার পর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা স্বামীকে জানালেন।

মাস্টারমশাই তখন তিন তলায় ঘুমাচ্ছেন। আজ আর বই ফিরি করতে বার হননি তিনি।

বিকেলে দাশরথী ওঁকে দেখতে এলেন। ওঁকে দেখে মাস্টারমশাই উঠে বসে বলেন, আয় দাশু। বোস্। আজ আর বের হইনি। কালও আমার ছুটি।

—দুপুরে ঘুমটা হয়েছিল ?

—হ্যাঁ। তুই বোধহয় ঘুমের ওষুধ কিছু দিয়েছিলি। নয় ? দুপুরে এত ঘুমাই না তো কখনো !

ডাক্তারবাবু বুঝতে পেরেছেন—কী কারণে মাস্টারমশাই ঐ ছবিখানি পেড়ে তাকে ছুরি-বিদ্ধ করেছেন। গুরু মহারাজের কেচ্ছা-সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকাখানা পড়ে আছে খাটের উপর। তিনি বরং জানতে চাইলেন—কেন মাস্টারমশাই তখন অমন মিথ্যা কথাটা বললেন : পেন্সিল ছুলতে গিয়ে ওঁর হাত কেটেছে। কিন্তু সরাসরি সে প্রশ্নটা পেশ করলেন না। গল্পগুজবের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে বললেন, ঐ টাইপ-রাইটারটা কত দিয়ে কিনেছিলেন স্যার ?

—কিনিনি তো। ওটা আমার এক ছাত্তর উপহার দিয়েছিল !

—ছাত্র ? আমাদের ব্যাচের ? কী নাম ?

—না, তোদের ব্যাচের নয় ! সেই যে ছেলেটাকে পরীক্ষার হলে গলা টিপে ধরেছিলুম।

—তাই নাকি ? তার সঙ্গে তাহলে পরে আপনার দেখা হয়েছিল ? তবু নামটা মনে পড়ে না ?

—দেখা তো হয়নি। একটা বেগানা লোক হঠাৎ একদিন ওটা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল সেই ছেলেটির একটি চিঠি। সে সময় আমি বেকার। থাকতুম একটা ছাপাখানায়। এক গাড়োল অধ্যাপকের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় আমার চাকরি যায়। লোকটা অঙ্কের কিছু জানত না, বুঝলি ? যে অঙ্ক পাঁচটা স্টেপে কষা যায়, তাকে···

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন, সে গল্প আপনি আগেও বলেছেন। টাইপ-রাইটারটার কথা বলুন।

—হ্যাঁ। টাইপ-রাইটার। তখন তো আমি বেকার। কী করব, কোথায় দু মুঠো অন্ন সংস্থান হবে এই শুধু চিন্তা। এমন সময় একটা বেগানা লোক পৌঁছে দিয়ে গেল ঐ উপহারটা। আর একখানা চিঠি। দাঁড়া তোকে দেখাই···

কাগজপত্র অনেক ঘেঁটেও পত্রটি খুঁজে পেলেন না উনি। শেষে বললেন, তাহলে বোধহয় যত্ন করে রাখিনি। তবে চিঠির বক্তব্যটা আমার মনে আছে। হতভাগা লিখেছিল—"স্যার। আমার অপরাধেই আপনার চাকরি যায়। টুকছিলাম আমি আর চাকরি খোয়ালেন আপনি ! আমি এখন ভালই রোজগার করি। শুনেছি আপনি বেকার। চাকরি জোগাড় করা আপনার পক্ষে শক্ত। কিন্তু আপনি তো ভাল টাইপ করতে পারতেন, স্যার। এক কাজ করুন—হাইকোর্টের কাছে অনেকে ফুটপাথে বসে টাইপ করে, নিশ্চয় দেখেছেন। দলিল দস্তাবেজ কপি করে। স্বাধীন ব্যবস্থা। চাকরি খোয়াবার ভয় নেই। এই সঙ্গে একটি টাইপ-রাইটার, কাগজ আর কার্বন পাঠিয়ে দিলাম। আবার আপনি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ান। এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার নামটা উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়। যদি আমার নাম ভুলে গিয়ে থাকেন তবে ভুলেই থাকুন। মনে আনবার চেষ্টা করবেন না। ইতি আপনার অযোগ্য সেই ছাত্র।" বুঝলি দাশু ! চিঠি পড়া শেষ করে তাকিয়ে দেখি যে-লোকটা যন্ত্রটা নামিয়ে রেখেছে সে ইতিমধ্যে হাওয়া !···ছেলেটার মনটা ভাল ছিল, তাই না ? ওর গলা টিপে ধরাটা আমার উচিত হয়নি।

ডাক্তারবাবু এবার প্রসঙ্গান্তরে চলে আসেন। দেওয়ালের একটা হুকের দিকে আঙুল তুলে বলেন, ওখানে একটা ছবি ছিল না, মাস্টারমশাই ?

শিবাজীপ্রতাপ অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যাঁ, হুক আছে,

ফ্রেমের অবস্থিতিজনিত কারণে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে ঐ জায়গাটার একটা বর্ণপার্থক্যও নজরে পড়ে। দীর্ঘসময় সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, ঠিকই বলেছিস। ওখানে অনেকদিন ধরে একটা ছবি টাঙানো ছিল। কার ছবি বল্‌তো?

দাশরথী স্বীকার করলেন না। বলেন, না, এমনিতেই মনে হল। দেওয়ালে কেমন একটা চৌকো দাগ হয়েছে না? অনেকদিন কোন ছবি টাঙানো থাকলেই সচরাচর এমন দাগ হয়।

—য়ু আর পার্ফেক্টলি কারেক্ট মাই বয়। আশ্চর্য। কিছুতেই মনে পড়ছে না তো! অথচ এঘরে আমিই তো থাকি। আমাব মনে পড়া উচিত। কার ছবি হতে পারে?

দাশরথী বুঝতে পারেন, 'হত্যা' মানে মুছে ফেলা। ছুরিটি গিঁথেই ওঁর মানসিক প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে। তাই স্মৃতি থেকে ঐ অপ্রিয় লোকটার ছবিও মুছে ফেলেছেন। এককালে যেমন অঙ্ক কষা হয়ে গেলে ব্ল্যাকবোর্ড মুছে ফেলতেন।

তাই আর এক ধাপ এগিযে গিয়ে বললেন, বাবা অমুক ব্রহ্মচারীর কি?

—হতে পারে। আই ডোণ্ট রিমেম্বার। তবে ভালই হয়েছে, ছবিটা খোয়া গেছে। লোকটা ভাল ছিল না, বুঝলি দাশু। পরশু কাগজে কী লিখেছে দেখেছিস্?

—না। কী?

আশ্চর্য! সংবাদপত্রে যেটুকু বার হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। শুধু সেই বিধবার নামটুকুই নয়, সাল-তারিখ, বিধবার সম্পত্তির অর্থ-নৈতিক মূল্য—সব কিছু।

সে-রাত্রে প্রমীলা স্বামীকে বললেন, তুমি অন্য কিছু ব্যবস্থা কর বাপু! আমার ভয় করে! এ কেমন জাতের পাগল?

ডক্টর দে বলেন, কেমন জাতের পাগল তা তোমাকে কী করে বোঝাই বল? মস্তিষ্কের যে-অংশটা স্মৃতিকে ধরে রাখে তার কয়েকটা স্নায়ু জট পাকিয়ে গেছে ওঁর। আর উনি একটা মনগড়া দুনিয়া গড়তে চান—এ দুনিয়ার কোন কোন বস্তু বা প্রাণীর উপর প্রচণ্ড বিদ্বেষে···

—ও সব বড় বড় কথা থাক। আজ যে কাণ্ডটা হল, এর পর ওঁকে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। কোন দিন হয়ত ছুরি নিয়ে মোকেই···

দাশরথী কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে একটি সিগারেট ধরালেন। মাস্টারমশাইকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন। হারানো বাপের মতোই। কিন্তু প্রমীলা যে কথা বলছে সেটাও ভাববার। মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে যে ধরনের আচরণ করেন তা সুস্থ

মানুষের নয়। তাকে রীতিমতো 'পাগলামী' বলা চলে। উনি নিজে ডাক্তার-মানুষ। যখন বাইরে যান তখন মৌ আর প্রমীলা এ বাড়ীতে অরক্ষিত থাকে। স্বজ্ঞানে না হোক 'অজ্ঞান' অবস্থায় যদি মাস্টারমশাই—

ছয়

পুলিস কর্তৃপক্ষ তবু সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। সমস্ত খবরটা সংবাদপত্রে প্রকাশ করার স্বপক্ষে প্রায় সকলেই ভোট দিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ডক্টর ব্যানার্জি। তার মতে A B C—না এখন ওর নাম B.C.D.—লোকটা 'নটোরিটিই' চাইছে। কাগজে সব কিছু ছাপা হলে তার হত্যালিপ্সা আরও বেড়ে যাবে। আরও আত্মপ্রচার চাইবে। আরও খুন করবে।

ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, ওর 'এগো' যদি স্ফীত হয়, তাহলেই ওর সতর্কতা কমে যাবে। ও ভাববে—বাসু-সাহেব আর পুলিস তার বুদ্ধির তুলনায় কিছুই নয়। ও ভুল করবে!

মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর পলাশ মিত্র বললেন, আমার অভিজ্ঞতা বলে—তা আদৌ হবে না। ওর হত্যালিপ্সাটাই শুধু বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতাটা হ্রাস পাবে না। আপনারা বারে বারে বলছেন, ওর মনের দুটো অংশ আছে—'ডুয়েল পার্সোনালিটি'। একটা অংশে 'মেগ্যালোম্যানিয়া'—'হামবড়াই ভাব'। সে অংশটা ওকে বলছে: তুমি একজন দুর্লভ প্রতিভা! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপরাধী! পি. কে বাসু বা পুলিস বিভাগ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় অংশটা 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক'—সে হত্যাবিলাসী। জ্যাক দ্য রীপারের মতো। মার্ডারার স্টোনম্যানের মতো। জন দ্য কীলারের মতো। কিন্তু আমার মতে তার মনের ভিতর আরও দুটি সত্তা আছে।

—আরও দুটি?

—হ্যাঁ। তিন-নম্বর—সে শিশুর মতো সরল। কৌতুকপ্রিয়, শিশু-সাহিত্য পাঠে তার আগ্রহ, লুকোচুরি খেলায়, ধাঁধা সলভ করায়, লেগ-পুলিং করায়। ওর মস্তিষ্কের সে অংশটা পরিণত হয়নি। বাচ্চাদের দলে ভিড়ে সে আজও খেলতে চায়: ও কুমীর তোর জলকে নেমেছি! আর চতুর্থ দিক: লোকটা অঙ্ক কষতে ভালবাসে। থিওরি অব নাম্বার্স, তার প্রিয়। হয় অ্যাসেণ্ডিং অর্ডার, অথবা ডিসেণ্ডিং অর্ডার। তার প্রতিটি পদক্ষেপ আঙ্কিক ছকে বাঁধা।

ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, যেহেতু ওর টাইপ-করা কাগজের পিছনে সর্বদা অঙ্কই থাকে?

—শুধু সে জন্য নয়। আপনার থার্ড লেটারটা দিন তো বাসু-সাহেব?

বাসু-সাহেব ওঁর সকালে পাওয়া তিন নম্বর চিঠিখানা মেলে ধরলেন।

ডক্টর মিত্র তিনখানি চিঠি পাশাপাশি রাখলেন টেবিলের উপর। বললেন, লক্ষ্য করে দেখুন, তিনখানি চিঠি যদিও দশ-পনের দিন আগে-পরে টাইপ করা কিন্তু একটা আঙ্কিক যোগাযোগ আছে। যেন একটা ম্যাথ্‌মেটিক্যাল সিরিজ! তিন নম্বর চিঠিখানা দেখুন প্রথমে।

সকলে ঝুঁকে পড়েন।

তিন নম্বর চিঠি, যেখানি প্রাপ্তিমাত্র বাসু-সাহেব ছুটে এসেছেন, তার আকৃতি ও বয়ান একই রকম। খাম, কাগজ, টাইপ-রাইটারের সেই ছোট হাতের 't' অক্ষরটা একইভাবে লাইন ছাড়া। এবারেও উপরে একটি—একরঙা ছবি। অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা। চিঠিটা এই রকম :

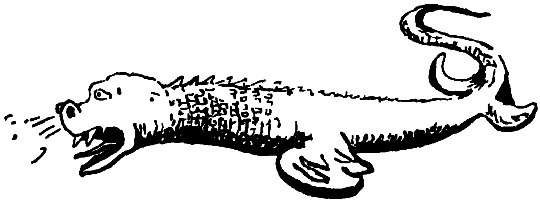

'C'-FOR CHILLANOSARAUSAIH NAMAH।

শ্রীযুক্ত পি. কে. বাসু বার-অ্যাট লয়েষু,

" ·আমরা মনে করিলাম যে, এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ দিন গেল, দশ দিন গেল, কেবল চীৎকারই চলতে লাগল, খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।"

কী দুঃখের কথা।

খেড়ে জন্তুটা চীৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে যদি নদীর দিকে চলে যেতে রাজী থাকে তাহলে সংবাদপত্রে পার্সোনাল কলমে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। অযথা বাকি চতুর্বিংশতিটি হতভাগ্য সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারে।

অধীর আগ্রহে কাগজের পার্সনাল কলম লক্ষ্য করব। খেড়ে জন্তুটা হার মানল কি?

'C' FOR CHANDANNAGAR তাং : নভেম্বরের সাতই। ইতি

গুণমুগ্ধ

C.D.E.

ডক্টর মিত্র বললেন, লক্ষ্য করে দেখুন, দশ-পনের দিন আগে-পিছে টাইপকরা চিঠিগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আঙ্কিক নিয়মে। প্রথম চিঠির সম্বোধন

'শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু', দ্বিতীয়টাতে 'শ্রীল' বাদ গেছে, তৃতীয়টিতে 'বাবু' পরিত্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধা, সৌজন্যবোধ তিল-তিল করে কমছে। ওদিকে পত্র শেষেও প্রথম চিঠিতে 'একান্ত গুণমুগ্ধ,' দ্বিতীয়ে 'একান্ত' পরিত্যক্ত, তৃতীয়তে একটি নূতন শব্দ 'গুণসন্ধিগ্ধ'। নিজের নামটাও একটা ম্যাথ্‌মেটিকালি প্রগ্রেশানে এগিয়ে চলেছে—A.B.C, B.C.D, এবারে C.D.E। লোকটা অঙ্কের মাস্টার হলে আমি বিস্মিত হব না।

ইন্সপেক্টার বরাট বলেন, দশ-পনের দিন আগে-পিছে টাইপ করলেও ওর কাছে তো আগেকার চিঠির অফিস-কপি থাকতে পারে?

—পারে? আমার সন্দেহ হয়। ফাইল করে যে অফিস-কপি সাজিয়ে রাখে, সে না পাগল, না ক্রিমিনাল! আমার মতে লোকটা আদৌ কোনও কপি রাখেনি। যাতে তার বাড়ি সার্চ করে আপনারা নিশ্চিত প্রমাণ না পেতে পারেন। আমার তো ধারণা, চিঠিগুলো একই টাইপ-রাইটারে টাইপ করাও নয়। অতি সযত্নে দু-তিনটি টাইপ-রাইটারে 't' অক্ষরটাকে ঐ ভাবে উঠিয়ে ছাপানো হয়েছে।

ডক্টর ব্যানার্জি প্রতিবাদ করেন, না। আমার দৃঢ় ধারণা সব চিঠি একই যন্ত্রে ছাপা। শুধু পত্রশেষের ঐ তারিখ আর ব্লক ক্যাপিটালে ছাপা নামগুলো ভিন্ন টাইপ-রাইটারে ছাপা। অর্থাৎ 'A For ASANSOL, 7th inst', 'B for BURDWAN, 17th inst' এবং 'C for CHANDANNAGAR, 7th Nov'—এই অংশগুলির টাইপ ভিন্ন যন্ত্রের।

—আপনি বলতে চান ঐ রকম একটা ধূর্ত ক্রিমিনাল এ ধরনের একটা টাইপ-রাইটার নিজের হেপাজতে রাখবে? বাড়ি সার্চ হলে যা হবে একটা জোরালো এভিডেন্স?

—তা কী করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? হয়তো যন্ত্রটা রাখা আছে অন্যত্র। যেখানে গিয়ে নির্জনে বসে টাইপ করার সুযোগ তার আছে।

বাসু-সাহেব বলেন, আমার প্রশ্ন: খবরটা কি কাগজে ছাপিয়ে দেবেন? দিলে আজই ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ সময়ের ব্যবধান এবার মাত্র দু-দিন।

আই. জি. ব্যানার্জি বলেন, সেটা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। পোস্টাল জোনটা ভুল টাইপ করায় চিঠিখানা অহেতুক ডেলিভারি হতে দেরি হয়েছে।

নিউআলিপুরের 700053-র বদলে খামে অসাবধানে ছাপা হয়েছে 700035। ফলে খামের উপর পোস্টাল ছাপটা উনত্রিশে অক্টোবরের হওয়া সত্ত্বেও চিঠিখানি বাসু-সাহেবের হস্তগত হয়েছে মাত্র আজই সকালে—অর্থাৎ নভেম্বরের পাঁচ তারিখে। আলমবাজার পোস্টঅফিস থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে।

এস. এস. বার্ডওয়ান রেঞ্জ বলেন, দু দিনই যথেষ্ট। আমার ব্যাটেলিয়ান রেডি। আজই খবরটা আমরা প্রেস-এ দিচ্ছি। তিনখানি চিঠির ব্লক সমেত সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যেকটি নামী দৈনিক পত্রিকায় সরকারী প্রেস-নোট হিসাবে ছাপা হয়ে যাবে। এ ছাড়া সরকারী বিজ্ঞাপনও থাকবে। চন্দননগরের প্রতিটি মানুষ—অন্তত 'সি' অক্ষর দিয়ে যার নাম বা উপাধি সে সতর্ক থাকবে। ঐ একটি দিন—সাতই নভেম্বর।

বাসু বলেন, তারিখটা সাতই, কিন্তু তিথিটা কি স্মরণ আছে আপনার?

—তিথি? মানে?

—শুক্লা অষ্টমী। চন্দননগবে ঐদিন জগদ্ধাত্রী পূজা। প্রায় লাখ খানেক বহিরাগত ওখানে আসবে। সেটা ভেবে দেখছেন?

আই. জি. ক্রাইম সাহেব শুধু বললেন, মাই গড!

বাসু বললেন, আমার কিন্তু ধারণা পোস্টাল-জোন নাম্বারটা সজ্ঞানকৃতভাবে ভুল ছাপা। যাতে চিঠিটা ডেলিভারি হতে দেরী হয়।

ইন্সপেক্টার বরাট মুচ্‌কি হেসে বললেন, এটা কিন্তু আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'বিলো-দ্য-বেল্ট' হিট্ করা হচ্ছে বাসু-সাহেব। প্রতিবারই সে পাঁচ-সাতদিন সময় আমাদের দিয়েছে। ঠিকানার ভুলটা স্বজ্ঞানকৃত নয়!

বাসু কোনও অফেন্স নিলেন না। বললেন, কিন্তু লোকটা বুঝতে পারছে আমরা ক্রমশঃ সতর্ক হয়ে উঠছি। আশঙ্কা করেছে, এবার হয়তো আমরা ব্যাপারটা কাগজে ছাপিয়ে দেব। সে জন্যই সে ঐ বিশেষ দিনটি বেছে নিয়েছে। কারণ সে জানে,ঐ দিন 'সি' নামের অসংখ্য যাত্রী এক বেলার জন্য চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা দেখতে যাবে। আর হয়তো চিঠিখানা আমরা পাব ঐ সাত তারিখেই!

—কিন্তু বহিরাগত যাত্রীর মধ্যে কার নাম অথবা উপাধি 'সি'-অক্ষর দিয়ে তা সে কেমন করে জানবে?

—তা কেমন করে বলব? বনানী ব্যানার্জি যে ঐ ট্রেনে বর্ধমানে যাবে সেটাই বা সে কেমন করে জানল? বনানী তো সারদিন বর্ধমানে ছিল না!

আই. জি. সি বললেন, যেমন করেই হ'ক—চন্দননগরেই যেন এই বীভৎস নাটকের যবনিকা পাত হয়!

বরাট বললেন,—আমাদের চেষ্টার ক্রটি হবে না স্যার।

স্থির হল, ভোর চারটে চব্বিশের ফার্স্ট টু হাণ্ড্রেড ওয়ান আপ লোকালে শতখানেক প্লেন-ড্রেস পুলিস চন্দননগর যাবে। বিভিন্ন গ্রুপে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে সারা শহরে। নামী খবরের কাগজে পর পর দুদিনই সাবধান-বাণীটা ছাপা হবে। ছয় ও সাত তারিখে।

পরদিন সকাল। অর্থাৎ ছয় তারিখ। বেলা নটা নাগাদ। বিডনস্ট্রীট বাড়ির চিলে-কোঠার ঘর। ভিতর থেকে ঘরটা ছিটকানি বন্ধ। চৌকি এবং টেবিল দুটিই স্থানচ্যুত। চৌকির উপর বিছানো আছে সেদিনের সংবাদপত্র। আর গৃহস্বামী চতুষ্পদের ভঙ্গিতে সারা ঘরটা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রায় মিনিট পনের হামা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বুড়ো মানুষ, মাজাটা ধরে গেছে। একটু আড়ামোড়া ভাঙলেন, তারপর আবার তুলে নিলেন খবরের কাগজটা।

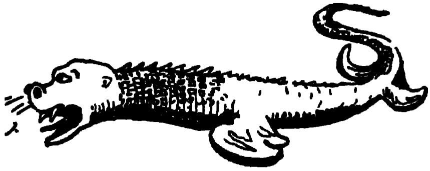

যা খুঁজছিলেন এতক্ষণ ধরে, তা পাননি। একটা পেনসিল-কাটা ছুরি আর পেন্‌সিলটা।

অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে চিন্তা করলেন। সিদ্ধান্তে এলেন—ছুরিটা নিশ্চয় বৌমা অথবা দাশু সরিয়ে নিয়ে গেছে। পাছে তিনি আবার হাত কেটে ফেলেন। এ সিদ্ধান্তের পিছনে দুটি যুক্তি। এক নম্বর, ওঁর টেবিলের উপর রাখা আছে একটা পেন্‌সিল-কাটা কল। যেগুলোয় হাত কাটে না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেন্‌সিল-কাটা যায়। নিঃসন্দেহে দাশু রেখে গেছে। দু নম্বর, ওঁর দাড়ি কামানোর সরঞ্জামটি অন্তর্হত। খোঁজ করেছিলেন সেটার বিষয়ে। দাশু বলেছিলেন, 'আপনি এবার থেকে দাড়ি রাখুন স্যার। বেশ খোলতাই অধ্যাপক-অধ্যাপক দেখাবে।' উনি হেসে জবাবে বলেছিলেন, 'দূর পাগল! দাড়ি রাখলেই কি থার্ড-মাস্টার কলেজের অধ্যাপক হয়?'

কিন্তু বুঝতে পেরেছেন—শেভিং সেটটা ওরা ইচ্ছে করেই সরিয়ে নিয়ে গেছে। সেফটি রেজার নয়, উনি বরাবর ক্ষুর দিয়ে কামাতেন।

তা সে যাই হোক—পেন্‌সিলটা গেল কোথায়?

গভীরভাবে চিন্তা করেও মনে করতে পারলেন না, ওঁর এই চিলে-কোঠার ঘরে কোন পেন্সিল কোন কালে কখনো ছিল কি না। কাগজপত্র সব উল্টে-পাল্টে দেখলেন—না! পেন্সিলের লেখা তো কোথাও নেই! সব কলম অথবা ডট্ পেন! তাহলে 'কী' ছুলতে গিয়ে অমন মারাত্মকভাবে হাতটা কাটল সেদিন? তবে কি…

ওঁর ডায়েরিটা বার করে আনলেন। খবরের কাগজের সংবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বৃদ্ধ যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। ওঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে। বিচিত্র কোয়েন্সিডেন্স। কাকতালীয় ঘটনা। পর পর দু বার? প্রব্যাবিলিটির অঙ্কটা কী ভাবে কষতে হবে?

ডায়েরিতে লেখা আছে: উনিশে অক্টোবর রাতে উনি ছিলেন আসানসোলের একটি হোটেলে। সাতাশে বর্ধমানে যান, ফেরেন আঠাশে। রাত্রে কোথায় ছিলেন? ডায়েরিতে লেখা নেই। রাত দুটোর সময়? ডায়েরি নীরব। সাতাশে কোন ট্রেনে বর্ধমান যান? ডায়েরি নিরুত্তর!

তবে কি··?

অসম্ভব! এ হতে পারে না! তিনি ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাটবেন কেন? কিন্তু টিকিট ছাড়াই যদি তিনি ঐ কামরায় উঠে থাকেন? একটি অরক্ষিতা মেয়ে·· নীল সিল্কের শাড়ি পরা··নীল ব্লাউস · রেলকামরায় আর কেউ নেই··· আবছা-আবছা মনে পড়ছে না?···

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন দশটা আঙুল নিজের অজান্তেই কখন বিস্তারিত হয়ে গেছে! একি? একি! তিনি ওঁর মাথার বালিশটার গলা টিপে ধরেছেন।

নিজের অজান্তেই আর্তনাদ করে ওঠেন বৃদ্ধ।

নিজের কণ্ঠস্বরেই।

তৎক্ষণাৎ সম্বিত ফিরে আসে।

একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

বৃদ্ধ দ্রুত হাতে খাট আর টেবিলটাকে স্বস্থানে সরিয়ে দিলেন। খবরের কাগজটাকে বিছানার তলায় চাপা দিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার ছিটকানি খুলে দিতে।

—কী হয়েছে স্যার? চীৎকার করে উঠলেন কেন?—চৌকাঠের ও প্রান্তে সস্ত্রীক দাশরথী।

—আমি? কই না তো।—দীর্ঘ-দীর্ঘদিন বাদে সজ্ঞান অনৃতভাষণ করলেন হেমাঙ্গিনী বয়েজ স্কুলের প্রাক্তন থার্ড মাস্টার।

দাশরথী বললেন, আশ্চর্য! আমি যে স্পষ্ট শুনলাম!

—তা হবে। পাগল মানুষ তো!

দাশরথীর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রমীলা। মাস্টারমশাই বললেন, বৌমা বর্ধমানে যেদিন গেলাম—ও মাসের সাতাশ তারিখে—সেদিন আমি কি সকালের ট্রেনে গেছিলাম, না রাতের ট্রেনে?

প্রমীলা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন বলুন তো?

—ডায়েরিতে লিখে রাখতে ভুলেছি।

একটু মনে করে প্রমীলা বললেন, বর্ধমানে তো? সকালে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে বলে গেলেন বর্ধমান যাচ্ছি, মনে নেই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।—আসলে কিন্তু কিছুই মনে পড়েনি ওঁর!

ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক নেমে গেলে উনি একটু চিন্তা করলেন। অঙ্কের মাস্টার।

পাচ মিনিটেই সম্ভ হয়ে গেল অঙ্কটা। ডানহাতের তালুটাই কেটেছে। আঙুল-গুলো অক্ষত। লিখতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ডায়েরির সেদিনের পাতাখানা খুললেন। ছয়ই নভেম্বর। দেখলেন, লেখা আছে: "চন্দননগর—ঘড়িঘর থেকে গঙ্গাঘাট, বাঁ-হাতি প্রত্যেকটি দোকান ও বাড়ি।" ওঁর নিজেরই হাতের লেখা। কবে লিখেছিলেন সে-কথা মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে মহারাজের পত্রপ্রাপ্তিমাত্র এটা লিখেছিলেন ডায়েরিতে। পাতা উল্টে দেখলেন, সাতই নভেম্বরের পাতায় লেখা আছে মহারাজের নির্দেশ: ডুপ্লে কলেজ থেকে ফটকগোড়া—বাঁ-হাতি সব দোকান ও বাঁড়ি। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন।"

উনি ডায়েরির ছয় তারিখের পাতায় এখন লিখলেন—"সকাল আটটা দশ: খবরের কাগজ ক্রয়। সাড়ে আট: পেন্সিল খুঁজিলাম। পাইলাম না। পৌনে নয়টা: বৌমা বলিল, সাতাশ তারিখ সকালের ট্রেনে বর্ধমান গিয়াছিলাম। এখন নয়টা চল্লিশ: স্টেশান অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। উদ্দেশ্য—এগারোটা দশের গাড়িতে চন্দননগর রওনা হওয়া। বাসযোগে হাওড়া যাইব।"

ডায়েরিটা বন্ধ করে এবার আলমারিটা খুললেন। বেছে বেছে খান দশ বারো বই ব্যাগে ভরে নিলেন। সবই ধর্মপুস্তক। এখনো অনেক বইয়ের প্যাকেট খোলাই হয়নি। উপায় কি? লোকে যে ধর্মপুস্তক কিনতেই চায় না। শিবাজীপ্রতাপ এজন্য বিব্রত। মহারাজ যদি বিক্রীত বইয়ের উপর কমিশন দিতেন তাহলে সঙ্কোচের কিছু থাকত না। কিন্তু তিনি মনি-অর্ডারে ওঁকে মাস-মাহিনা দেন—বিক্রি হোক আর না হোক। নিঃসন্দেহে মহারাজ ওঁকে তির্যকপন্থায় অর্থ সাহায্য করতেই এ ব্যবস্থা করেছেন। ভাবখানা: ভিক্ষা নয়, উনি উপার্জন করছেন। উপায় কি?

টাইম টেবলটা দেখলেন। এগারোটা দশের লোকালখানা ধরতে চেষ্টা করবেন। নিশ্চয়ই সেটা ধরা যাবে। কিন্তু প্রতি আধ ঘণ্টা পর পর ডায়েরিতে উনি লিখে যাবেন—সময় উল্লেখ করে—কখন, কোথায় উনি কী করছেন। স্মৃতির উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না। উনি দেখতে চান—আগামীকাল চন্দননগরে যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, যদি ইংরাজী 'C' অক্ষরযুক্ত নামের কোনও হতভাগ্য—আহ্! সেকথা ভাবাও যায় না। না যাক! উনি দেখতে চান, দুর্ঘটনার মুহূর্তে উনি কোথায়, কী করছিলেন। স্মৃতিনির্ভর সিদ্ধান্ত নয়—ডায়েরি কী বলে!

কুঁজো থেকে গড়িয়ে এক গ্লাস জল খেলেন। ক্যাম্বিসের জুতোর ফিতে বাঁধলেন। তারপর বইয়ের ব্যাগটা তুলে নিয়ে এবং ডায়েরিখানা তুলে টেবিলের উপর ফেলে রেখে অঙ্কের মাস্টারমশাই ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করেন।

একতলার ডাক্তারখানায় ওঁকে আটকালেন ডাক্তারবাবু। বললেন, আজ আর নাই গেলেন স্যার? আপনার শরীর এখনো দুর্বল!

—না, না! আমার শরীরটা ভালই আছে। বৌমাকে বলে দিও, কাল সন্ধ্যায় ফিরব।

—কোথায় চলেছেন আজ?

—শ্রীরামপুর।

মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল কথাটা!

মুখ ফস্‌কে? না কি পাকা-ক্রিমিনালের মতো?—মনে মনে ভাবলেন অঙ্কের প্রাক্তন থার্ড মাস্টারটি! মুখটা বেদনার্দ্র হয়ে ওঠে! এ কী হোল তাঁর? এত মিথ্যে কথা কী ভাবে বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে? জিহ্বা যেন ওঁর শাসন মানছে না! আশ্চর্য! উনি কি নিজের অজান্তেই তিল তিল করে বদলে যাচ্ছেন? নির্বিরোধী গণিতশিক্ষক থেকে একটা পাকা ক্রিমিনালে রূপান্তরিত হচ্ছেন? ডোরিয়ান গ্রে-র ছবিখানার মতো?

ডাক্তারবাবু বললেন, শ্রীরামপুর? চন্দননগব নয় তো?

যেন ইলেকট্রিক শক্‌ খেয়েছেন বৃদ্ধ। তাঁর আপাদমস্তক একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। দরজায় চৌকাঠখানা ধরে সামলে নিলেন নিজেকে। আমতা আমতা করে বলেন, চ-ন্দ-ন-ন-গ-র! ও…ও-কথা বললে কেন হঠাৎ?

ওঁর ভাবান্তরটুকু ডাক্তারবাবুর নজর হয়নি। তিনি সিরিঞ্জ হাতে রুগীর বাহুমূলটা ধরে ইন্‌জেকশান দেওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। সেদিকে তাকিয়েই বললেন, এক নম্বর: আজ সেখানে প্রচণ্ড ভীড়—কাল জগদ্ধাত্রী পূজা। দু-নম্বর: আজ খবরের কাগজ দেখেননি?

বৃদ্ধ জবাব দিতে পারলেন না। গলকণ্ঠটা বারকতক ওঠা-নামা করল। ঢোক গিললেন।

যাকে ইন্‌জেকশান দেওয়া হচ্ছিল সেই রোগীটি বলল, সাংঘাতিক খবর মশাই। বিশ্বাস হয়? খুনিটা নাকি দেখতে নিতান্ত সাধারণ—আপনার-আমার মতো!

বৃদ্ধ নতনেত্রে নেমে পড়েন পথে। বিনা বাক্যব্যয়ে।

সামনেই একটা পান বিড়ির দোকান। আয়নাটায় দেখতে পেলেন নিজ প্রতিবিম্ব। নিতান্ত সাধারণ! আপনার-আমার মতো!

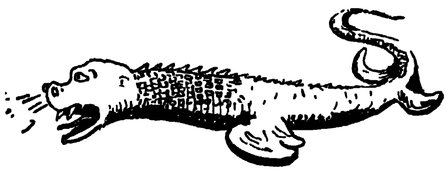

ছয় তারিখ রাত আটটা।

নৈশাহারে বসেছেন বাসু-সাহেব। সপরিবারে। সচরাচর ওঁরা ডিনারে বসেন রাত সাড়ে নয়টায়।

আজ দেড়ঘণ্টা আগে। কারণ আগামীকাল ভোর পাঁচটার মধ্যে উনি গাড়ি নিয়ে চন্দননগর যাবেন। ওঁরা তিনজন। রাণীদেবী বাদে। ফলে রাত চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে উঠতে হবে। গাড়িতে পেট্রল ভরা আছে। সঙ্গে যা যাবে সবই গাড়িতে তোলা হয়েছে। শুধুমাত্র বাসু-সাহেবের রিভলভারটা ছাড়া।

কৌশিক বললে, তৃতীয় চিঠিখানার ঐ লাইনটা রোমান হরফে বাঙলায় কেন টাইপ করা হল এটা আমি বুঝতে পারিনি। ঐ যে **"Amra mone karılam je, aibar Becharake khabe bujhi"**…ইত্যাদি। ওটার ইংরাজি অনুবাদ করা হল না কেন?

বাসু-সাহেব বললেন, জবাব দেবার আগে একটা প্রতিপ্রশ্ন করি: 'ব্যাচারা-থেরিয়াম্' আর 'চিল্লানোসরাস্' জন্তু দুটোকে চেন?

কৌশিক বলে না, জুরাসিক পিরিয়ডের ডাইনসর নয়, এটুকুই শুধু বলতে পারি।

—কেমন করে জানলে?

—'এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা' আর 'জুওলজিক্যাল ডিক্সনারি' ঘেঁটে।

—হুঁ! তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন? অথবা রাণুকে?

কৌশিক নীরব। বাসু-সাহেবই আবার বলেন, সঙ্কোচে?

কৌশিক আম্‌তা আম্‌তা করে, না, মানে ভেবেছিলাম কাল্পনিক কোনও জীব।

—বটেই তো! কিন্তু কল্পনাটা কার? …জান না! সুকুমার রায়ের নাম শুনেছ? শোননি! না শোনাই স্বাভাবিক, যেহেতু তিনি সিনেমা করতেন না! অন্তত সত্যজিৎ রায়ের নামটা তো শুনেছ? ঐ যে, যে ভদ্রলোক 'পাঁচালীর পথে' না কী যেন একখানা পিকচার তুলেছেন? বিভূতি মুখুজ্জে না বলাইচাঁদ বাড়ুজ্জে কার যেন লেখা বইটা! শোননি?

রাণীদেবী হাসতে হাসতে বলেন, এতে কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে তুমি ঐ লোকটার চিঠি পেয়ে দারুণ ক্ষেপে গেছ। এতটা মেজাজ খারাপ তো সচরাচর কর না তুমি?

তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে রাণীদেবী বললেন, ওটা সুকুমার রায়ের লেখা 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' থেকে একটা উদ্ধৃতি। নিছক হাসির গল্প। অবশ্য এখন দেখছি 'নিছক হাসির' নয়, ও গল্পটা পড়ে কেউ কেউ ক্ষেপেও যায়!

আড় চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি।

বাসু-সাহেব নির্বাক আহারে মন দিলেন।

সাত

সাত তারিখ।

গাড়িটা যখন চন্দননগর থানা-কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করল তখন সকাল ছয়টা সাতচল্লিশ।

বাসু-সাহেবের নজরে পড়ল—থানা-কম্পাউণ্ডে বসে আছেন কয়েকজন: ইন্সপেক্টার বরাট, রবি বোস, আর চন্দননগর থানার ও.সি. দীপক মাইতি। গাড়িটা পার্ক করে উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ওঁর পিছন-পিছন কৌশিক আর সুজাতা। কেউ ওঁদের স্বাগত জানালেন না। সুপ্রভাতও নয়। কেমন একটা খট্‌কা লাগল বাসু-সাহেবের। যেন ওঁরা সবাই কী একটা শোক-বার্তা শুনে একমিনিট নীরবতা পালন করছেন।

বাসু সবিস্ময়ে বলেন, কী ব্যাপার? সবাই সাতসকালেই এমন চুপচাপ?

দীপক বিহ্বল ভাবে উঠে দাঁড়ায়। রবি মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। ইন্সপেক্টার বরাট বলে ওঠেন, উই আর এক্সট্রিম্‌লি সরি বাসু-সাহেব! দ্য ড্রামা ইজ ওভার। নাটকের শেষ যবনিকা পড়ে গেছে।

বাসু নিজের অজান্তেই বসে পড়েন। অস্ফুটে বলেন, মানে?

—বাংলা মতে অবশ্য ছয় তারিখ—যেহেতু সূর্যোদয় হয়নি—কিন্তু ইংরাজি মতে 'সি.ডি.ই' তার কথা রেখেছে। সাতই সকাল সাড়ে পাঁচটায়।

—কে? কোথায়? কখন খবর পেলেন?

—খবর পেয়েছি মিনিট পাঁচেক আগে। টেলিফোনে। ডেড-বডি এখনো সেখানেই পড়ে আছে। আমরা যাচ্ছিলাম। আসুন, আপনি বরং নিজের গাড়িটাই নিন।

দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল দুখানি জীপ। থানার সামনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে জনা-দশেক পুলিস—য়ুনিফর্মে এবং ছদ্মবেশে। কে কোথায় পাহারা দেবে সব নির্দেশ এখনো পায়নি ঐ কজন। দীপকের ইঙ্গিতে তাদের কয়েকজন উঠে বসল জীপের পিছনে।

মটোরকেডটা প্রায় গোটা চন্দননগর শহরটা পাড়ি দিল। গঙ্গার কাছাকাছি একটা প্রায়-নির্জন অঞ্চলে এসে থামল। প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা দ্বিতল একটি সাবেকি বাড়ি। সামনে ঢালাই লোহার কারুকার্য করা গেট। বোঝা যায়, এককালে সৌখিন বাগান ছিল বাড়িটা ঘিরে—এখন আগাছায় ভর্তি। দারোয়ান সসম্ভ্রমে স্যালুট করে বললে, ইধার পাধারিয়ে সা'ব!

বাড়িতে ঢুকলেন না ওঁরা। দারোয়ানকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন গঙ্গার দিকে। উঁচু একটা বালিয়াড়ি মতো। হয়তো কোন যুগে গঙ্গার ভাঙন

কথাতে কেউ মাটি ফেলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়েছিল। এখন কালকাশুন্দির জঙ্গলে ভরা। সেখানে একটা কংক্রিটের বেঞ্চি পাতা। জায়গাটা এমন যে, রাস্তা থেকেও নজরে পড়ে না, গঙ্গার দিক থেকেও নয়। সেই কংক্রিটের বেঞ্চির ঠিক সামনে পড়ে আছে মৃতদেহটা। মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক, বয়স পঞ্চাশের বেশ নিচে। পরনে ফুলপ্যান্ট, পুরোহাতা সার্ট, হাফহাতা সোয়েটার, গলায় মাফলার জড়ানো। পায়ে মোজা ও হান্টিং শু। একটু দূরে ছিটকে পড়ে আছে একটি সুদর্শন হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা সৌখিন ছড়ি। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট: মাথার পিছন দিকটা থেঁতলে গেছে!

বাসু-সাহেব আপন মনে অস্ফুটে বললেন, আসানসোল!

সুজাতা সবিস্ময়ে একবার তাঁর দিকে তাকালো। কৌশিক কানে কানে তাকে বলল, অর্থাৎ সেই প্রথম পদ্ধতিটা। আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে কোন হাতুড়ি নিয়ে এসেছিল লোকটা।

পুলিস ফটোগ্রাফার চার-পাঁচটা ফটো নিল। স্ট্রেচার নিয়ে যারা অপেক্ষা করছিল তারা বলল, অব্ উঠাই সা'-র?

—জেরা সে ঠাহ্‌র যাও!—বললেন ইন্সপেক্টার বরাট। মৃতব্যক্তির পকেট তল্লাসী করে দেখলেন। লাইফ-টাইম পার্কার কলম, মানিব্যাগ—তাতে শ-দুই টাকা, নোটে ও ভাঙানিতে, রুমাল, নস্যির ডিবে, একটা নোট বই। লিস্ট বানানো হল। দুজন সাক্ষীর সই নিয়ে ইনকোয়েস্টও করা হল। বাঁ-হাতের ঘড়িটা ভাঙেনি—সেটা টেরও পায়নি যে, তার মালিকের হৃদস্পন্দন থেমে গেছে। ঠিকই সময় দিচ্ছে ঘড়িটা: টিক্‌টিক্—টিক্‌টিক্!

বাসু বরাটকে বললেন, কে উনি? কী নাম?

—ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি অব্ চন্দননগর!

—ডক্টর? মেডিক্যাল প্র্যাক্‌টিশনার?

—না। ডকটরেট। বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন। আসুন, ঘরে গিয়ে বসি।

দারোয়ান পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা খুলে ওঁদের বসতে দিল। গৃহবাসী কেউই এগিয়ে এলেন না ভিতর থেকে। বোধহয় সকলেই শোক-বিহ্বল। মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে অপেক্ষা করে বাসু-সাহেব প্রশ্নটা না করে পারলেন না, আর কে কে আছেন বাড়িতে? আই মীন···

জবাব দিল থানা-অফিসার দীপক মাইতি, আছেন ওঁর স্ত্রী, কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ। শয্যাশায়ী। আর আছেন ডক্টর চ্যাটার্জির শ্যালক মিস্টার বিকাশ মুখার্জি। কিন্তু তিনি গতকাল বিকালে কলকাতা গেছেন। আজ সকালেই ফেরার কথা। এনি মোমেণ্ট এসে পড়বেন।

—আর কেউ নেই? যার কাছে কিছু জানতে পারি? অন্তত দুটো খবর···

—কী স্যার সে-দুটো? আমি ওঁদের বেশ ভালভাবেই চিনি। আই মে হেল্প য়ু।—জানতে চায় দীপক।

—এক নম্বর: ডক্টর চ্যাটার্জি খবরের কাগজ পড়তেন কিনা, আর দু নম্বর: তিনি জানতেন কি না যে, তাঁর নাম চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি।

দীপক চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপব বললে, আমি মিস্ গাঙ্গুলীকে খবর পাঠিয়েছি। উনি বলতে পারবেন···মানে, গতকালকাব কাগজটা ডক্টর চ্যাটার্জি দেখেছেন কি না।

—মিস গাঙ্গুলীটি কে?

—ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

—আই সী। ওঁর কারবারটা কী ছিল?

—কোন কারবারই ছিল না স্যার···আমি যতটুকু জানি বলি, মানে ব্যাকগ্রাউণ্ডটা—

চন্দননগরের এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার এককালে যথেষ্ট ধনী ছিলেন। বিশিষ্ট বনেদী পরিবার। চন্দ্রচূড়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন ফরাসী সরকারের বেনিয়ান। জাহাজে মাল আমদানি রপ্তানি করতেন। জাহাজ যেত শহর কলকাতা পণ্ডিচেরি হয়ে মার্সেল্‌স্ বন্দরে। এক পুরুষে যা সঞ্চয় করেন বাকি চারপুরুষ তা এখনো শেষ করে উঠতে পারেননি। চন্দ্রচূড়ের পিতামহ ছিলেন আবার অন্য জাতের মানুষ। বিখ্যাত চারু রায়ের ছাত্র ছিলেন তিনি—রাসবিহারী, কানাইলাল, শ্রীশ ঘোষদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ যখন চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী চলে যান তখন তাঁর কিছু প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল। তাঁর নাতি চন্দ্রচূড় বাঙলায় এম. এ. পাস করে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপর হঠাৎ রিজাইন দিয়ে বাড়ি বসেই একটি গবেষণা করছেন আজ পাঁচ-সাত বছর ধরে। গুটি পাঁচসাত কলেজের ছেলে প্রতিদিন কলেজ ছুটির পর এ-বাড়িতে আসে। কী সব রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়। সে সব ব্যাপার দীপক ঠিক জানে না—ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী অনিতা গাঙ্গুলী বলতে পারে।

চন্দ্রচূড় তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। এবং তিনি নিঃসন্তান। স্ত্রীর স্বাস্থ্য কোনকালেই ভাল ছিল না। মাস ছয়েক হল একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। ঠিকে ঝি, চাকর, দারোয়ান সংসারটা চালায়। মহাদেব ড্রাইভার গাড়ি চালায়। চন্দ্রচূড়ের নির্দেশে নয়—তিনি সাতে-পাঁচে নেই—বিকাশের ব্যবস্থাপনায়। সে এ পরিবারে আছে আজ বছর-দশেক। বাইরের দিকটা সেই দেখে, সংসারটা এতদিন দেখতেন রমলা অর্থাৎ মিসেস চ্যাটার্জি—ইদানিং উনি শয্যাশায়ী হবার পর, অনিতা।

বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ সে এল। একটা রিক্শা চেপে। ওর সঙ্গে

একটি বছর বিশেকের কলেজী ছাত্র। বস্তুত সেই খবর পেয়ে অনিতাদিকে ডেকে এনেছে।

কৌশিকের মনে হল—অনিতার বয়স ত্রিশের কাছে-পিঠে। কিন্তু মেদবর্জিত সুঠাম দেহ। মাজা রঙ, মুখখানি মিষ্টি—কেঁদে কেঁদে এখন চোখ দুটো রক্তিম। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই।

দীপক ওকে চেনে মনে হল। নাম ধরে ডাকল, এস অনিতা। ব'স, এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন। তোমার কাছে কিছু জানতে চান।

অনিতা বসল না। প্রতিপ্রশ্ন করল, বিকাশদা কই?

—কোলকাতায়। এখনো ফেরেননি।

—সে কি! কাল রাত্রেই তো তাঁর ফিরে আসার কথা। দিদিকে বলা হয়েছে? ···আই মীন, মিসেস্ চ্যাটার্জিকে?

এবার জবাব দিল বলাই—গৃহভৃত্য। বললে, না' তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন। কিছু জানেন না।

দীপক পুনরায় বলল, তাঁকে জানানোটা জরুরী নয়। আদৌ জানানো হবে কি না তা ডাক্তার বলবেন। মোট কথা, বিকাশবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে জানানো হবে না। তুমি বস। এঁরা তোমাকে···ইনি হচ্ছেন ইণ্টেলিজেন্স বিভাগের মিস্টার বরাট, আর উনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। প্লীজ টেক্ য়োর সীট।

তবু বসল না অনিতা। তার হাতব্যাগ খুলে একটা নোট বই বার করল। সঙ্গের ছেলেটিকে বললে, বাব্‌লু, এই নম্বরে তুই একটা কল বুক করতো।

—কার নম্বর ওটা?—জানতে চাইল দীপক দারোগা।

—'সুইট হোম' নামের একটা হোটেল। শেয়ালদায়। হ্যারিসন রোড ফ্লাইওভারের কাছে। বিকাশদা সচরাচর কলকাতায় নাইট হল্ট করলে ওখানেই ওঠে। ম্যানেজারের নাম হলধরবাবু।

কৌশিকের খেয়াল হয়নি, কিন্তু সুজাতার মনে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জেগেছে: বিকাশ দেখতে কেমন? বয়স কত? অনিতা যখন কলকাতায় যায় তখন নিশ্চয় প্রয়োজনে 'সুইট হোমে' ওঠে। তার মানে কি ওরা দুজনে যখন··· না, তা হতে পারে না! হলধরবাবুও নিশ্চয় চেনেন ওদের।···কোনও ডব্‌ল্-বেড রুমে···অসম্ভব!

সম্বিৎ ফিরে পেল যখন, তখন নজর পড়ল—ঘরের ওপ্রান্তে বাবলু টেলিফোন ডায়াল করছে, আর অনিতা বসে বসে তার এজাহার দিচ্ছে।

অনিতা বাঙলায় এম. এ.। ডক্টর চ্যাটার্জিকে রিসার্চে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে নটা নাগাদ আসে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি

ফটকগোড়া অঞ্চলে। বাবা নেই। মা আছেন, একটি ভাই আছে। সে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। কলকাতায় কোন সওদাগরী আফিসে চাকরি করে। এভাবে বছর পাঁচেক সে কাজ করছে ডক্টর চ্যাটার্জির কাছে।

বাসু প্রশ্ন করেন, আপনাকে উনি কোনও রিসার্চ অ্যালায়েন্স দেন?

—মাহিনাই বলতে পারেন। মাসে পাঁচ শ। তাছাড়া দুপুরে এখানেই খাই। বলাই রান্না করে। বিকালে যারা আসে—মানে, কলেজের ছাত্ররা—ওরা ঘণ্টা হিসাবে অ্যালায়েন্স পায়। আমিই হিসাব রাখি।

—গবেষণাটা কী নিয়ে?

—উনি একটা 'রবীন্দ্র-অভিধান' রচনা করছেন। আমরা স্বরবর্ণ শেষ করে ব্যঞ্জনবর্ণের 'প' অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছেছি—

বাসু বলেন, 'রবীন্দ্র-অভিধান' মানে?

মিস্টার বরাট ওঁকে বাধা দিয়ে বলেন, মাপ করবেন, বাসু-সাহেব, এ সব অ্যাকাডেমিক আলোচনা আপনি পরে করবেন। আমাকে কয়েকটা জরুরী ব্যাপার জেনে নিতে দিন আগে।

—অল রাইট! য়ু মে প্রসীড!—বাসু পাইপ ধরালেন।

বরাটের প্রশ্নোত্তরে জানা গেল আরও কিছু তথ্য। বিকাশ ব্যাচিলার। পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হয় তাকে। চন্দননগরকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্বে কলকাতার একটি মেসে থাকত। ওর দিদি শয্যাশায়ী হবার পর থেকে এখন চন্দননগরই ওর হেড কোয়ার্টার্স। তবে সপ্তাহে তিন রাত্রি থাকে কি না সন্দেহ।...হ্যাঁ, ডক্টর চ্যাটার্জি গতকাল খবরের কাগজটা পড়েছিলেন। চন্দননগরে যে আজ একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড হতে পারে—এবং টার্গেট যে 'C' অক্ষরের নামের অধিকারী এ কথা জানতেন। চন্দ্রচূড়ের নাম ও উপাধি দুটোই 'সি' দিয়ে, সুতরাং...

রবি বোস প্রশ্ন করে, বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি প্রাতর্ভ্রমণ করতেন। তা আপনি তাঁকে বলেননি আজ সকালে এভাবে একা-একা বার হওয়া তাঁর উচিত হবে না?

—আমি বলিনি। বিকাশদা বলেছিলেন।

—কেন, আপনি বলেননি কেন?

—কাল রবিবার ছিল। ছেলেরা কেউই আসেনি। আমারও আসার কথা ছিল না। কিন্তু খবরের কাগজটা পড়ে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এখানে একটা ফোন করি। বিকাশদা ফোন ধরেন। তিনি বলেন, খবরের কাগজ ওঁরাও পড়েছেন। উনি এবং 'স্যার'। যাবতীয় সাবধানতা ওঁরা অবলম্বন করছেন। তবু আমি শান্ত হতে পারিনি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ একটা রিক্শা নিয়ে

এ-বাড়ি চলে আসি। কারণ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না—ওঁর নাম ও উপাধি দুটোই 'সি' দিয়ে।

এখানে এসে স্যারের দেখা পাননি। উনি বিকালেও ঘণ্টা-খানেক বাগানে অথবা গঙ্গার ধারে পায়চারি করেন। তাই বাড়ি ছিলেন না। তবে বিকাশদা ছিলেন। গাড়ি নিয়ে কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। মহাদেব ড্রাইভারই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। চন্দ্রচূড়ের নিরাপত্তার বিষয়ে কী কী সাবধানতা নেওয়া হয়েছে বিকাশবাবু তা অনিতাকে বিস্তারিত জানালেন। দারোয়ান সতর্ক থাকবে, কোন লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। গেট সমস্ত দিন রাত তালাবন্ধ থাকবে। কোন অজুহাতেই যেন বাইরের কেউ না ঢোকে। বড-সাহেবের অনুমতি নিয়ে কেউ যদি নেহাতই বাড়িতে ঢোকে তাহলে দারোয়ান একটা খাতায় তার নাম, ধাম, সময় ও স্বাক্ষর রাখবে। এরপর নাকি অনিতা ওঁকে অনুরোধ করেছিল, 'আজ কলকাতায় নাই বা গেলেন, বিকাশদা?' তার জবাবে উনি বলেছিলেন, 'আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে অনিতা, তবে আজ তো রোববার, ঘোষিত তারিখটা আগামী কাল, সাতই। আমি আজ রাত্রেই যেমন করে হোক ফিরে আসব।'

—তারপর?—জানতে চাইলেন বরাটসাহেব।

—তারপর ওঁরা রওনা হয়ে গেলে আমি দারোয়ানের কাছে খাতাখানা দেখতে চাই। দেখি, সে একটি খাতায় নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে নিষ্ঠাভরে 'এন্ট্রি' করেছে। কে আসছে, যাচ্ছে, সব।

—ডক্টর চ্যাটার্জি জানতেন না এসব কথা?

—কেন জানবেন না? খবরের কাগজ তিনিই সবার আগে পড়েন। পড়ে বিকাশবাবুকে ডেকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমার নামটা যে ভয়াবহ তা অ্যাদ্দিন জানতুম না।' উনিই বিকাশবাবুকে এইসব সাবধানতার কথা বলেছিলেন এবং নিজে থেকেই বলেছিলেন যে, তিনি সাত তারিখে আদৌ বাড়ির বাইরে যাবেন না।

—মিসেস্ চ্যাটার্জি বা বলাইকে কিছু বলেননি আপনি?

—দিদিকে কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না। আর বলাই সে সময় বাড়ি ছিল না।

—আপনি একটু অপেক্ষা করলেন না কেন? উনি ফিরে আসা পর্যন্ত?

—আমার তাড়া ছিল। আমি আরও কয়েকজনকে ব্যক্তিগতভাবে সাবধান করে দেব স্থির করেছিলাম—আমার বান্ধবী চন্দ্রা চৌধুরী, এক বুড়ি পিসিমা চন্দ্রমুখী চট্টরাজ, আর ঘড়িঘরের কাজে একজন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, চিমন্‌লাল ছাব্‌রিয়া। ওঁর মেয়েকে আমি পড়াই।

এই সময় বাবলু বলে উঠে, সাইলেন্স প্লীজ!

সকলে তার দিকে ফেরে। বাবলু ততক্ষণে টেলিফোনের কথা মুখে বলছে, 'হুইট হোম'? আমি চন্দননগর থেকে বলছি···হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাঙ্ক লাইনে। মিস্টার বিকাশ মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক ইয়েস্! ওঁর বাড়িতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে · হ্যাঁ, হ্যাঁ চন্দননগরেই ওঁকে একটু ঠিক আছে আমি ধরে থাকছি।

এদিকে ঘুরে বলে, ওদের হোটেলে ঘরে ঘরে ফোন নেই। বিকাশদা ঘরে আছে ডাকতে লোক গেছে।

ইন্সপেক্টার বরাট এক লাফ দিয়ে এগিয়ে যান। বাবলুর হাত থেকে টেলিফোন রিসিভারটা ছিনিয়ে নেন। বললেন, লেট মি স্পীক ··

একটু পরে শোনা গেল এক তরফা কথোপকথন: বিকাশবাবু?···হ্যাঁ, চন্দননগর থেকেই বলছি। কী ব্যাপার? কাল রাত্রে ফিরলেন না যে? না, আপনি আমাকে চিনবেন না। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, অ্যাক্সিডেন্ট। না, না, আপনার ভগ্নিপতি ভালই আছেন? ও তাই নাকি? তাঁর নামও 'C' দিয়ে? কী? না, আপনাদের বাড়ির কেউ নয়। যিনি খুন হয়েছেন তাঁর নাম চিমনলাল ছাবড়িয়া। গঙ্গার ঘাটে! হেড ইঞ্জুরি। বিকজ আপনাদের বাড়ির সামনেই, এবং পুলিস আপনাদের চাকর না দ'রোয়ান কাকে যেন অ্যারেস্ট করেছে। অনিতাদেবীর কাছে শুনলাম এই নম্বরে আপনাকে পেতে পারি, উনিই আপনাকে ফিরে আসতে ইয়েস্! যতশীঘ্র সম্ভব!

ল.ইনটা কেটে দিলেন উনি।

অনিতা বলে ওঠে, মানে? অহেতুক মিথ্যা কথা বললেন কেন?

—এতটা পথ ড্রাইভ করে আসবেন। না হয় বাড়ি এসেই দুঃসংবাদটা শুনবেন!

দীপক বলে, ইতিমধ্যে ওঁর স্টাডিরুমটা কি একটু দেখবেন? সেখানে যদি কোনো ক্লু

বরাট বললেন, তুমি দেখে এসো, আমরা একটু পরে যাচ্ছি।

অনিতা আন্দাজ করে তাঁর অনুপস্থিতিতে ওঁরা কিছু আলোচনা করতে চান। তাই বলে, চলুন, আমি ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছি। তুইও আয় বাব্‌লু।

ওঁরা ভিতরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করতেই রবি বলে, আপনি হঠাৎ বিকাশবাবুকেই সন্দেহ করলেন যে?

বরাট বলেন, কবি বলেছেন, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—" কী যেন বাসু-সাহেব?

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে পাদপূরণ করেন, 'কাল-কেউটে সাপ!'

রবি বললে, কিন্তু এটা তো একটা 'অ্যাল্‌ফাবেটিক্যাল সিরিজে'র থার্ড টার্ম, বিকাশবাবু!

বরাট বলেন, ইয়াং ম্যান! তার গ্যারান্টি কোথায়? 'C.D.E.' হয়তো সন্ধ্যায় বা দুপুরে আর কোন 'সি'কে খুন করবে। এটা একটা ইণ্ডিভিজুয়াল মার্ডার কেস! কেন হতে পারে না? এমনকি হতে পারে না যে, চন্দ্রচূড় একটি উইল করে তাঁর সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যেতে চান? তিনি নিঃসন্তান, তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। ফলে তাঁর নিকটতম আত্মীয় এবং ওয়ারিশ ঐ C.D.E-র ঘোষণার সুযোগ নিয়ে—যেহেতু তাঁর ভগ্নিপতির নাম চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি এই অপকর্মটা করে বসল? এবং তারপর এমনও হতে পারে যে C.D.E চন্দননগরে এসে শুনল, সাম মিস্টার 'C C C' ফৌত হয়েছেন! সে ব্যাটা কোন উচ্চবাচ্য না করে কেটে পড়ল। আর ঝড়ে মরা কাকটার কেরামতি বুদ্ধিমান ফকিরের মত দাবী করে বসল? সে-ক্ষেত্রে বিকাশকে পুলিস কোনদিনই সন্দেহ করবে না। তোমার ডিডাক্‌শান মত চন্দ্রচূড় মার্ডারটা চিরটাকাল ক্রিমিনালদের ইতিহাসে লেখা থাকবে অ্যাল্‌ফাবেটিকাল সিরিজের থার্ড টার্ম হিসাবে।

বাসু বলেন, কারেক্ট, ভেরি কারেক্ট। শুধু তাই বা কেন বরাট সাহেব? সেই 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক্'টাকে যখন আমরা গ্রেপ্তার করব তখনো হয়তো সে স্বীকার করবে না যে, থার্ড মার্ডারটা সে করেনি। কারণ ফাঁসি তো তার একবারই হবে! একটা খুন করুক অথবা তিনটেই। সে তো হত্যার রেকর্ড তৈরি করে ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে নিজের নাম লিখে দিতে চায়।

বরাট উঠে দাঁড়ান। রবির দিকে ফিরে নিজের মাথায় একটা টোকা মেরে বলেন, এখানকার গ্রে-সেলগুলোকে আর একটু সচল রাখ রবিবাবু। ডোণ্ট টেক এভরিথিং অ্যাট দেয়ার ফেসভ্যালু!

বাসু বরাট-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাউ ডিড্ হি টেব দ্য পাঞ্চ? মানে, জামাইবাবুর বদলে ছাববিয়া খুন হয়েছে শুনে?

—নরম্যাল রিয়্যাক্‌শন! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কৃত্রিম সৌজন্যবশতঃ বলল, কী দুঃখের কথা! কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল—অ্যাক্‌সিডেণ্ট শুনেই সে আঁৎকে উঠেছিল। জামাইবাবু ভাল আছেন শুনে জেনুইনলি রিলিভ্‌ড! আসুন, এবার স্টাডিটাকে স্টাডি করি।

—আপনি দেখুন। আমরা একটু পরে আসছি।

বরাট হাসলেন। বলেন, অল রাইট!

একাই এগিয়ে গেলেন তিনি ডক্টর চ্যাটার্জির স্টাডি রুমের দিকে। বাসু বলেন, রবি, ঐ দারোয়ান বাবাজীবনকে একটু ডাক দিকিন।

দারোয়ান এল। জেরার উত্তরে জানালো যে, গেট রোজ রাত্রেই তালাবন্ধ থাকে। বড়সাহেব ভোরবেলা রোজই বেড়াতে যান, তখন এসে সে গেট খুলে দেয়। আজ সকালে সে গেট খুলতে আসেনি, কারণ ছোটবাবু বলে গিয়েছিলেন যে, বড়াসাব আজ সকালে বেড়াতে যাবেন না। বড়াসাবের নাকি তবিয়ৎ খারাপ। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, বড়াসাব ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গেট খুলে

—বড়াসাহেবের কাছে যে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, তা তুমি জানতে?

—জী নেহী সাব!

—বড়াসাহেবের তবিয়ৎ খারাপ, এ কথা তোমাকে কে বলল?

—ছোটাসাব! তবিয়ৎ খারাপ হ্যয় ইয়ে বাৎ নেহী বোলা, লেকিন বোলা থা কি উন্হোনে ঘরসে বিলকুল বাহার নেহি যায়েঙ্গে। ইস্ লিয়ে ম্যয়নে সোচা ··

—তোম্‌নে অখ্‌বরমে যো খবর

—জী নেহী সাব! আজই শুনা! 'বিশ্বামিত্র'মে বহ্ খবর নেহী থা কল!

বাসু-সাহেব ত্বরিৎগতি রবির দিকে ফিরে বলেন, 'বিশ্বামিত্রে' ইন্‌সার্শন দেওয়া হয়নি?

রবি সলজ্জ বললে, ঠিক জানি না স্যার!

—ছি-ছি-ছি! বিশ্বামিত্রে 'ডবল কলম—পাঁচ সেন্টিমিটার' বিজ্ঞাপন দিতে কত খরচ পড়ে?

রবি চুপ করে ভর্ৎসনা শোনে।

বাসু-সাহেব বার কতক পায়চারি করে ফিরে এসে বললেন, দারোয়ানজী, তোমার খাতাটা নিয়ে এস তো।

দারোয়ান সেলাম করে তার ঘর থেকে খাতাটি আনতে গেল।

—আশ্চর্য তোমরা! আই. জি. ক্রাইম-সাহেব ক্লিয়ার ইন্‌স্ট্রাক্‌শন দিলেন ···আর তোমরা···কী ভেবেছ তোমরা? পশ্চিমবঙ্গে উর্দুভাষী, হিন্দিভাষী লোকের নাম 'সি' অক্ষর দিয়ে হয় না? নাকি চন্দননগরে আজ যে কয়েক হাজার মানুষ আসছে তারা সবাই বাংলা-ইংরাজি জানে?

রবি এ কথা বলল না যে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না। মাথা নিচু করে ভর্ৎসনাটা শুনল। দোষটা যারই হোক, আরক্ষা-বিভাগের। ফলে, সেও দোষী।

খাতাটা এল। হিন্দিতে লেখা। বাসু-সাহেব বললেন, তুমি পড়ে শোনাও দারোয়ানজী। আমি হাতে-লেখা দেবনাগরী হরফ ভাল পড়তে পারি না।

দারোয়ান পড়ে শোনায় : এতোয়ার : এক বাজ কর দশ মিনিট··· পরকাশ্‌বাবু···

—প্রকাশবাবুটি কে ?

বড়াসাহেবের দোস্ত্‌। তিনি মিনিট-কুড়ি ছিলেন। খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে গেছেন : প্রকাশচন্দ্র নিয়োগী। তারপর বিকাল চারটেয় এসেছিল স্থানীয় কিছু ছেলে, জগদ্ধাত্রী পূজার চাঁদা চাইতে। বড়াসাহেব ঘুমোচ্ছেন বলে দারোয়ান তাদের তাড়ায়। পাঁচটা দশে অনিতা দিদি। দারোয়ান তাঁর স্বাক্ষর দাবী করেনি। সওয়া ছে বাজে কিতাববাবু—কিন্তু ভিতরে ঢোকেননি।

—কিতাববাবুটি কে ?

দারোয়ান জানায় ভদ্রলোককে সে আগে কখনো দেখেনি। বেগানা লোক বলে হাঁকিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু খোদ বড়াসাব তাকে ভিতর থেকে দেখতে পান। এগিয়ে এসে কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটের দুপাশ থেকে তাঁদের কী সব বাৎচিৎ হয়। লোকটা আদৌ ভিতরে আসেনি, কিন্তু বড়াসাহেব তার কাছ থেকে কী একটা কেতাব খরিদ করেন। ওঁর কাছে টাকা ছিল না তখন। বড়াসাহেবের নির্দেশ মত টাকাটা দারোয়ান ঐ কেতাববাবুকে মিটিয়ে দেয়। খরচটা খাতায় লিখে রাখে।

—তাঁর সই কই ?

—না। সই রাখা হয়নি। তিনি তো বাড়ির ভিতরে ঢোকেননি।

—বইটা কোথায় আছে জান ?

—বড়াসাবকা টেবিল প্যে হোগা সায়েদ।

—দেখ তো, খুঁজে পাও কিনা।

দারোয়ান স্টাডিরুমে ঢুকে গেল। একটু পরে ফিরে এল একখানি বাঁধানো বই হাতে। প্রকাশক : নবপত্র প্রকাশন। গ্রন্থের নাম—'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ'। লেখক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পাতাতে ডক্টর চ্যাটার্জির স্বাক্ষর ও গতকালকার তারিখ।

বাসু-সাহেব বলেন, তোমার মনে আছে দারোয়ানজী? লোকটার চেহারা ?

—জী হাঁ! বুঢ্‌ঢা, বড়াসাব সে উমর জেয়াদাই হোগা সায়েদ! পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। হাতে একটা ঝোলা, তাতে বহুত-সে কিতাব!

—গায়ে একটা 'ঢিলে-হাতা' ওভারকোট ছিল কি ?

দারোয়ান সবিস্ময়ে বলে, জী হাঁ!

—আর দেখ তো, তোমার হিসাবের খাতায় যে অঙ্কটা লেখা আছে সেটা কি সাড়ে বাইশ টাকা ? বইটার দাম ?

দারোয়ান দেখে নিয়ে বললে, জী হাঁ! আপকো কৈসে মালুম পড়া ?

উত্তেজনায় রবি দাঁড়িয়ে উঠেছে। বলে, স্যার! য়ু মীন…য়ু মীন…

বাসু সাহেব বইটার প্রথম পাতাটা খুলে ধরেন।

· ঝুঁকে পড়ে দেখল গ্রন্থটার দাম : পঁচিশ টাকা।

রবি বললে, মনে পড়েছে! আসানসোলের সেই ভদ্রলোকও বলেছিলেন টেন পার্সেন্ট কমিশনে লোকটা বই বেচতে এসেছিল। কিন্তু 'ঢিলে-হাতা' কোটটা…

—বাঃ! হাতুড়িটা তো আস্তিনের হাতার মধ্যেই রাখতে হবে!

—মাই গড! একটা বুড়ো ফেরিওয়ালা শেষ পর্যন্ত!

আট

আটই নভেম্বর। বেলা এগারোটা। লডন স্ট্রীটে আই. জি. সি-সাহেবের ঘরে কনফারেন্স।

ইন্সপেক্টার বরাট বললেন, এখন লোকটাকে খুঁজে বের করা তো ছেলেখেলা! উচ্চতা—একশ সত্তর/আশি সে. মি., ওজন—আন্দাজ সত্তর কে.জি। রঙ—তামাটে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। গায়ে ঢিলে হাতা কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বয়স অ্যারাউণ্ড ষাট। ক্যানভাসের ব্যাগে বই ফিরি করে।

ডি.আই.জি. বার্ডওয়ান বলেন, কিছু মনে করবেন না বরাটসাহেব। আপনি যা বলছেন তার অর্ধেক আন্দাজ, বাকি অর্ধেক এফিমেরাল!

—এফিমেরাল'! মানে?

—ক্ষণস্থায়ী। লোকটা হয়তো ইতিমধ্যে দাড়ি কামিয়েছে, জুতো ছেড়ে চটি পরেছে, ঢিলে-কোটটার বদলে এখন তার গায়ে পুরোহাতা সোয়েটার!

বরাট বলেন, কিন্তু আমরা যখন ওর ঘর সার্চ করব? তখন তো ঐসব জিনিস…

—আগে তার পাত্তা পাই, তার পর তো সার্চ। প্রশ্ন হচ্ছে, ওর যেটুকু বর্ণনা জানা গেছে তা জানিয়ে কি আমরা কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেব?

বাসু জানতে চাইলেন, 'বিশ্বামিত্র' 'ইত্তেফাক' ইত্যাদি সমেত?

ডি.আই.জি কঠিনভাবে বলেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা বাসু-সাহেব! বিশ্বামিত্রে বিজ্ঞাপন থাকলেও কাজ হত না। ডক্টর চ্যাটার্জিকে মৃত্যু টানছিল! নাহলে সব জেনেশুনেও তিনি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গেট খুলে শহীদ হতে যাবেন কেন?

রবি বলে, কোল্যাপসিব্‌ল্ গেটের দু-পাশ থেকে দুজনের কী কথোপকথন হয়েছে তা দারোয়ান জানে না। লোকটা কি ডক্টরসাহেবকে কোনভাবে সম্মোহিত করে…

ডক্টর পলাশ মিত্র সাইকলজিস্ট। বলেন, অসম্ভব! মানুষ সারারাত ঘুমিয়েও পরদিন ওভাবে সম্মোহিত হয়ে গেট খুলে বেরিয়ে যেতে পারে না। আমি অন্য একটা কথা ভাবছি। এ সংবাদটা কি আপনারা নিয়েছিলেন যে, ডক্টর চ্যাটার্জি 'সোমনাম্‌বোলিস্ট' কি না?

বাসু স্বীকার করেন, ছাটস্‌ আ গুড পয়েন্ট! না, ও সম্ভাবনার কথাটা আমাদের মনেই হয়নি। তা হতে পারে বটে! অনেকে ঘুমের ঘোরে নিজের অজান্তেই হেঁটে চলে বেড়ায়। কিন্তু তারা কি রাতের পোশাক ছেড়ে জামা-কাপড় পরতে পারে? গেট বন্ধ দেখলে চাবি খুঁজে নিয়ে···

ডক্টর মিত্র বলেন, খুব রেয়ার কেস-এ এমন নজিরও আছে!

আই. জি. ক্রাইম একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলে ওঠেন, অলরাইট! অলরাইট! ডক্টর চ্যাটার্জি কেন সব জেনে বুঝেও মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছিলেন তার হেতুটা আপনারা খুঁজে বার করেছেন। আমি অন্য একটি বিষয়ে উৎসাহী: ঐ হত্যা-বিলাসীটাকে কীভাবে আমরা খুঁজে পাব?

ডক্টর পলাশ মিত্র বলেন, থার্ড-মার্ডার থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, লোকটার 'ভিক্‌টিম্‌' চয়নে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। দুটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। দুটি বৃদ্ধ, একটি অল্পবয়সী। প্রথমটি নিম্নবিত্তের, দ্বিতীয়টি মধ্যবিত্তের, তৃতীয়টি উচ্চবিত্তের। এদের জীবনযাত্রা, উপজীবিকা, শিক্ষা-দীক্ষায় কোনই মিল নেই। এ থেকে একটিই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ও 'মেগালোম্যানিয়াক্‌'—ও মনে করে যে, ও নিজে একজন দুর্লভ প্রতিভার মানুষ। যেহেতু নিজ জীবিকায় সে স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম লিখে রেখে যেতে পারেনি তাই অন্য একটি ক্ষেত্রে—ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে—সে রক্তাক্ষরে নিজের স্বাক্ষর রেখে যাবে!

রবি বলে, দারোয়ানের জবানবন্দি হিসাবে লোকটাকে আদৌ পাগল বলে বোঝা যায় না কিন্তু।

ডক্টর ব্যানার্জি বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, সে-কথা তো প্রথম দিনেই আমি বলেছিলাম। জ্যাক দ্য রীপার, জন-দ্য-কীলারকে দেখেও বোঝা যায়নি যে, তারা হত্যাবিলাসী।

আই. জি. সাহেব বলেন, বাসু-সাহেব! আপনার কী সাজেশান? ঐ খুনিটাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে?

বাসু বলেন, আমাদের প্রথমে ভেবে দেখতে হবে, লোকটা কী ভাবে ভিন্ন-ভিন্ন শহরে ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের নাম-উপাধি জানল? কেমন করে বুঝতে পারল একটি বিশেষ পূর্ব-ঘোষিত দিনে ঠিক কোন মুহূর্তটিতে ঐ বিশেষ নামের মানুষটি সবচেয়ে ভাল্‌নারেব্‌ল্‌! এ ধাঁধাটা সমাধানের আগে তাকে ধরবার চেষ্টা বৃথা—

—আর একটু বিস্তারিত করে বলবেন?

—ধরুন আসানসোল। অধরবাবু যে অত রাত্রে দোকানে একা থাকবেন, হঠাৎ যে লোড-শেডিং হবে, এসব কথা তো হত্যাকারী জানত না। জানা সম্ভবপর নয়। বনানী যে গভীর রাত্রে ঐ ট্রেনের ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় একা থাকবে তাও নয়। তাহলে পাঁচ-সাত দশ দিন আগে থেকেই সে কীভাবে আমাকে ঐ জাতের চিঠি লিখতে পারে? ডক্টর চ্যাটার্জির হত্যাটা তো একেবারে ভেল্কির পর্যায়ে!

ইন্সপেক্টর বরাট মুচ্‌কি হেসে বলেন, ভেল্‌কি! তাহলে এতদিনে আপনি' আপনার আই. কিউ-র সমতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন বলুন?

বাসু-সাহেব ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, মিস্টার বরাট! চিঠিগুলো সে ব্যক্তিগত-ভাবে আমাকে লিখেছে বটে কিন্তু সে ব্যঙ্গ করেছে এই স্টেটের একটি বিশেষ বিভাগের ইণ্টেলিজেন্সকে – ট্যাক্সপেয়ারদের অর্থে যাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়! আমি ডিফেন্স-কাউন্সেল! অপরাধী খোঁজা আমার জাত ব্যবসা নয়।

আই. জি. সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, প্লীজ ব্যারিস্টার সাহেব…

পাইপ-পাউচ কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান।

আই. জি. সাহেব বলেন, আপনাকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, বাসু-সাহেব…হ্যাঁ, বরাটের ঐভাবে বলাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

ইন্সপেক্টর বরাটের মুখখানা কালো হয়ে যায়।

বাসু বলেন, আদৌ না! আমি স্বীকার করছি—লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী! কিন্তু তাকে পাকড়াও করা আমার কাজ নয়। আজ মিটিঙের শুরুতেই নিজ পদাধিকার বলে যিনি ঘোষণা করেছেন—'এখন তো লোকটাকে গ্রেপ্তার করা ছেলে-খেলা'—তাঁকে সেই খেলাটা শেষ করতে দিন। তারপর তাকে যখন আদালতে তুলবেন তখন হয়তো আবার আমার ভূমিকা শুরু হবে। ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে।

হঠাৎ ডক্টর মিত্র আই জি-কে বলে ওঠেন, স্যার! কিছু মনে করবেন না। আমরা পুলিস বিভাগের লোক নই। এক্সপার্ট-ওপিনিয়ান নিতে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন বলেই আমি, বাসু-সাহেব বা ডক্টর ব্যানার্জি এ মিটিঙে এসেছি.

ইন্সপেক্টার বরাট ধরা গলায় বলেন, অল-রাইট! আই অ্যাপলজাইজ।

বাসু-সাহেব বলেন, অল-রাইট! লেটস্ প্রসীড!

আলোচনা আরও অনেকক্ষণ চলল। কিন্তু না বাসু-সাহেব, না বরাট—কেউই মুখ খোলেননি। স্থির হল এখনই সন্দেহজনক ব্যক্তিটির আনুমানিক বর্ণনা সংবাদপত্রে ছাপানো হবে না।

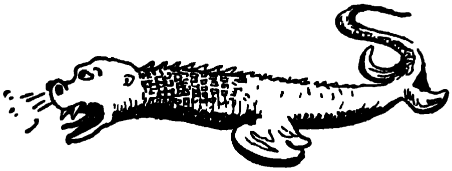

নয়-দশ-এগারো।

চারদিন পরে বারো তারিখের সকালে বিকাশ মুখার্জি আর অনিতা এসে হাজির হল বাসু-সাহেবের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। রাণী দেবীর মাধ্যমে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে তাঁরা দেখা করলেন ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে।

—কী ব্যাপার? আপনারা?

বিকাশ যা বললেন তার সারাংশ—ওরা পুলিসের উপর আদৌ ভরসা রাখতে পারছেন না। একটা 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক্' সমাজে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ওঁরা টি. এ. বিল বানাতে ব্যস্ত। ডক্টর চ্যাটার্জির কেসটার তদন্ত করবার জন্য বিকাশ মুখার্জি ওঁকে রিটেন করতে চান।

বাসু-সাহেব বললেন, তোমরা ভুল করছ। আমি গোয়েন্দা নই—

—আমরা জানি। ফর্মালি আমরা 'সুকৌশলী'কেই এনগেজ করব, কিন্তু যদি আমরা নিশ্চিন্ত হই যে, তার পিছনে আপনার ব্রেনটা আছে।

বাসু বলেন, লুক হিয়ার বিকাশবাবু। লোকটা ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই বারবার তিনবার পত্রাঘাত করেছে। আমাকেই 'ডি-ফেম' করেছে। এবং আমি সে খবর সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং এটা আমার একটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ। তোমরা রিটেন কর বা না কর

বাধা দিয়ে অনিতা বলে, মাপ করবেন স্যার। আপনি কি আমাদের দিকটাও একটু ভেবে দেখেছেন? একটা নৃশংস খুনী দেবতুল্য ডক্টর চ্যাটার্জিকে খুন করে গেল, আর আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব? কবে কোন ক্লু'র সাহায্যে ঐ বরাটসাহেব বিকাশদার হাতে হাতকড়া পরাবেন?

—বিকাশদা?

—আপনি কি বলতে চান, কেন সেদিন মিস্টার বরাট টেলিফোনে এক গঙ্গা মিথ্যে কথা বললেন তা বোঝেননি?

—আই সী!

—আপনি বিশ্বাস করেন, এটা সম্ভবপর? স্যারকে উনি বড় ভাইয়ের মতো দিদিকে বিধবা করা

বাধা দিয়ে বিকাশ বলে, প্লীজ অনিতা, থাম তুমি—

—না। আমাকে বলতে দাও বিকাশদা।

বাসু বলেন, এ প্রশ্নটাই অবৈধ। ডক্টর চ্যাটার্জি যখন খুন হন তখন বিকাশবাবু কোলকাতায়।

—তাহলে ? 'স্যার' কত লক্ষ টাকা রেখে গেছেন আমরা জানি না। কিন্তু তা থেকে কিছু খরচ করতে কেন দেবেন না আমাদের ? লোকটা আপনাকে চিঠি লিখেছে একথাও যেমন সত্য, তেমনি আমাদের সর্বনাশ করে গেছে এটাও তো মিথ্যা নয় ? আপনি একা কেন খরচ-পত্র করবেন। অ্যালাও আস টু হেল্‌প য়ু—

বাসু-সাহেব বললেন, অল রাইট। আই এগ্রি। লেটস্ ফর্ম এ টীম! আরও তিনটি লোকের কাছে আমি প্রতিশ্রুত। তাদের সাহায্যও আমি নেব। তাদের অর্থ নেই তোমাদের মত, কিন্তু আন্তরিকতা একইরকম আছে।

—কোন্ তিনজন স্যার ?—জানতে চায় বিকাশ।

—এক নম্বর, অধরবাবুর ছোট ছেলে সুনীল আঢ্য, দু নম্বর বনানীর পাণীপ্রার্থী অমল দত্ত আর তিন নম্বর বনানীর ছোট বোন ময়ূরাক্ষী।

বস্তুত সেদিনই সকালে বাসু-সাহেব ময়ূরাক্ষীর একখানি চিঠি পেয়েছিলেন। মেয়েটি লিখেছে, "আপনি সেদিন আমাদের জবানবন্দি নিতে আসেননি। সত্যই সেদিন আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। পরে পুলিস আমাদের জবানবন্দি নিয়ে গেছে। সেসব কাগজপত্র আপনি এতদিনে নিশ্চয় দেখেছেন। কিন্তু তারপরে আমি কয়েকটি সংবাদ ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছি। চিঠিতে তা জানানো সম্ভবপর নয়। প্রথমত অনেক অনেক কথা লিখতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট। আপনি ব্যস্ত মানুষ। আমিও যেতে পারছি না। বাবা-মাকে ছেড়ে এ সময় কলকাতা যাওয়া সম্ভবপর নয়। তাছাড়া বুঝতেই পারছেন, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা এখন·· জানি না, পরীক্ষাটা দেবার চেষ্টা করব, না চাকরি-বাকরি খুঁজব। টুইশানি একটা ধরেছি। সে যাই হোক, আপনার অধীনে একজন মহিলা সেক্রেটারি আছেন শুনেছি। তিনি কি আসতে পারেন একবার ? মহিলা হলেই ভাল হয়। কারণ আগেই বলেছি, ব্যাপারটা ডেলিকেট।"

এত কথা বাসু-সাহেব ভাঙলেন না অবশ্য। ডেকে পাঠালেন কৌশিক ও সুজাতাকে। স্থির হল, ওঁরা একটি বে-সরকারী অনুসন্ধান-দল গঠন করবেন। পরের সপ্তাহে রবিবার, বিশ তারিখে সন্ধ্যায় ওঁর বাড়িতে এই অনুসন্ধানকারী দলটির প্রথম অধিবেশন বসবে।

সুজাতা আর কৌশিক পরদিনই রওনা হয়ে গেল আসানসোল-ভায়া-বর্ধমান। তিনজনকে নিমন্ত্রণ জানাতে এবং সুনীল ও ময়ূরাক্ষীকে আসা-যাওয়ার রাহা-খরচ অজুহাতে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করতে আসতে। ময়ূরাক্ষীর বক্তব্য সুজাতা একাই শুনবে।

নয়

ঐ বারো তারিখ বিকেল সাড়ে চারটে। বিডন স্ট্রীটের বাড়ি।

কলিংবেল বাজাতে কুসমির মা সদর দরজাটা খুলে দিল। মৌ কলেজ থেকে ফিরে এল। খাতাপত্র নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখে, মুখোমুখি বসে আছেন ওর বাবা আর মা। বাবা ইজিচেয়ারে। তাঁর কোলের উপর একখানা ইংরাজি নভেল। খোলা অবস্থায় উপুড় করে রাখা। তিনি কিন্তু তাকিয়ে বসেছিলেন নিস্পন্দ সিলিঙ ফ্যানটার দিকে। মৌকে দেখে বললেন, আয়! আজ এত দেরী হল যে ফিরতে?

মৌ জবাব দিল না। বইখাতা টেবিলের উপর রেখে ঘুরে দাঁড়াল মায়ের মুখোমুখি। তাঁরও কোলের উপর পড়েছিল একটা আধ-বোনা উলের সোয়েটার। নিটিং-এর সরঞ্জাম হাতে তুলে নিয়ে বললেন, মিট-সেফে তোর খাবার রাখা আছে। খেয়ে নে।

মৌ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশ সচেতন। কলেজে যায় একটু সেজেগুজে। আজ কিন্তু তার প্রসাধনের চিহ্নমাত্র ছিল না—আটপৌরে একটা মিলের শাড়ি পরে কলেজে গিয়েছিল। সে মায়ের নির্দেশ মতো রান্নাঘরের দিকে গেল না। মুখ-হাত ধুতে কলঘরের দিকেও নয়। এসে বসল সামনের একটা সোফায়। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসু এক জোড়া চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন।

মৌ বলল, তোমাদের একটা কথা বলব?

কেউ জবাব দিল না। না অনুমতি, না আপত্তি।

—আমি যাদবপুরে ফিলজফি অনার্স নিয়ে পড়ি। আমার বয়স কুড়ি। আমি প্রাপ্তবয়স্ক।

ডাক্তারসাহেব বইটা তুলে নিয়ে নীরবে পাঠে মন দেন। প্রমীলা তাঁর বোনার সরঞ্জামটা নামিয়ে রেখে বললেন, এ-কথার মানে?

—হোয়াই ডোণ্ট টেক মি ইন কনফিডেন্স? তোমরা নিজেরাই পাগল হতে চাও, না আমাকে পাগল করতে চাও?

কর্তা-গিন্নির চোখাচোখি হল। গিন্নিই বললেন, কেন? আমরা কী পাগলামী করেছি?

—এক নম্বর: সকালে কলেজ যাবার সময় দেখে গেছিলাম বাপি তিপ্পান্ন পাতাটা পড়ছে। এখনও সেই পাতাটাই খোলা আছে। দু নম্বর: তোমার সেলাই এক-কাঁটাও আগায়নি। তিন নম্বর: আমার এক পিরিয়ড আগে ছুটি হয়েছে আজ। আমি সাড়ে পাঁচটায় সচরাচর ফিরে আসি। অথচ আমি ঢুকতেই বাপি বলল—আজ এত দেরী হল যে ফিরতে?

এতক্ষণে কথা বললেন, দাশরথী কারণটা তো তুই জানিস মৌ! একটা জলজ্যান্ত বুড়ো মানুষ পাঁচ-পাঁচটা দিন নিখোঁজ। আমরা বিচলিত হব না? আমরা কী করতে পারি?

—যা তোমার করণীয়। থানায় রিপোর্ট করা। মিসিং স্কোয়াডে! তুমি তা কেন করতে পারছ না, তা আমরা তিনজনেই জানি। কিন্তু আমরা পরস্পর তা আলোচনা করছি না। তোমরা দুজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছ কিনা তা আমি জানি না—আমাকে কেউ কিছু বলনি। চন্দননগর থেকে মাস্টার মশাই কেন ফিরে এলেন না, হঠাৎ কেন এমনভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন···

দাশরথী বলেন, চন্দননগর নয়, শ্রীরামপুর।

—না। চন্দননগর।

—ওটা তোর ভুল আন্দাজ। যেহেতু তুই ভেবেছিস···

—কী?

—তা তো বুঝতেই পারছিস! আমার মুখ দিয়ে নাই বলালি?

—অলরাইট! তোমাদের যখন এতই সঙ্কোচ, তখন আমিই মুখ ফুটে বলি: হ্যাঁ। আমার সেটাই আশঙ্কা। ওঁর স্মৃতি মাঝে-মাঝে হারিয়ে যায়। উনি মনে করতে পারেন না যে, একটা ফটো হুক থেকে পেড়ে তাকে ছুরি বিদ্ধ করতে গিয়ে ওঁর হাত কেটে গিয়েছিল···

ডাক্তার-সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন। প্রমীলা বললেন, হ্যাঁ, ওকে আমি বলেছি। ওর জানা থাকা দরকার। অনেক সময় একা একা থাকে··· মাস্টার মশাই···

ডাক্তার দে চট করে উঠে পড়েন। বার কয়েক নিঃশব্দে পায়চারি করে বলেন, কুসুমির মা কি···

—চলে গেছে। আমি সদরে ছিটকিনি দিয়ে এসেছি। তুমি মন খুলে বল—বললে মৌ।

—তোমরা ভুল করছ। ইয়েস্, আই অ্যাডমিট। ইতিপূর্বে তিনি মেণ্টাল অ্যাসাইলামে দু' বছর ছিলেন। আমার জ্ঞাতসারে তিন-তিনবার মানুষের গলা টিপে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই প্ররোচনা ছিল।··· না, না, প্রতিবাদ করিস না খুকু···আমি জানি, প্ররোচনাটা সামান্য। তোর-আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিন্তু ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য জাতের ছিল। পরীক্ষার খাতায় নকল করা, পূজামণ্ডপে মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা··· ঐ গুরুমহারাজের ভণ্ডামী ওঁর দৃষ্টিতে ছিল হিমালয়ান্তিক অপরাধ! কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখেছি, গায়ে মশা বসলে উনি চাপড় মারতেন না, হাত নেড়ে মশাটাকে উড়িয়ে দিতেন।··· ইয়েস! আসানসোল আর বর্ধমানের ঘটনা দুটো যেদিন ঘটে সেদিন উনি ঘটনাস্থলে

ছিলেন। নিতান্ত কাকতালীয় যোগাযোগ। বর্ধমানে উনি গেছিলেন সকালের ট্রেনে—তোর মার স্পষ্ট মনে আছে···

—কিন্তু চন্দননগর?

—আঃ! আবার বলছিস চন্দননগর! উনি সেদিন শ্রীরামপুরে গেছিলেন। অবশ্য বলতে পারিস আবার কোনও লোকাল ট্রেন ধরে···

—এক সেকেণ্ড! আমি আসছি।

মৌ উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। একটু পরে ফিরে আসে একটা ডায়েরি হাতে। বললে, এই পাতাটা পড়ছি শোন·· ছয়ই নভেম্বরের পাতা—

"চন্দননগর-ঘড়িঘর হইতে গঙ্গা ঘাট। বাঁ-হাতি প্রত্যেকটা দোকান ও বাড়ি।"

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে দাশরথী বলেন, কই দেখি ডায়েরিটা? ওটা তুই কোথায় পেলি?

—দিচ্ছি। সবটা আগে পড়ি। ঐ লাইনটা নীল কালিতে ফাউন্টেন পেন্-এ লেখা। তারপর ডট্-পেন-এ—মনে হয় অন্য সময়ে লেখা: "সকাল আটটা দশ: খবরের কাগজ ক্রয়। সাড়ে আট: পেন্সিল খোঁজা। পাইলাম না। পৌনে নয়টা: বৌমা বলিল, সাতাশ তারিখে সকালের ট্রেনে গিয়েছিলাম। এখন নয়টা চল্লিশ: এগারোটা চল্লিশের গাড়িতে রওনা হইতেছি। বাসযোগে হাওড়া স্টেশন যাইব।"

—তুই···তুই ওটা কোথায় পেলি?

মৌ সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। একই সুরে বললে, নেক্সট পেজ—

আবার নীল কালিতে ফাউন্টেন পেন-এ এন্ট্রি—মানে অনেক আগে—"সাতই নভেম্বর: ডুপ্লে কলেজ হইতে ফটকগোড়া—বাঁহাতি সব কয়টি দোকান ও বাড়ি। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন।" এর পর বাকি পাতা সব খালি।

এবার সে ডায়েরিটা বাপের হাতে তুলে দেয়। তিনি নিজেও আদ্যন্ত পড়লেন। আগেকার কিছু পৃষ্ঠাও উল্টে দেখলেন। সম্ভবত আসানসোল ও বর্ধমানের বিশেষ দিন-ছুটির পাতা। প্রমীলাও দেখছিলেন ঝুঁকে পড়ে।

কন্যার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে বললে, তোমার প্রশ্নটার জবাব মুলতুবি আছে। এটা খুঁজে পেয়েছি তিনতলার চিলে-কোঠার ঘরে। তোমাদের কিছু বলিনি। যেহেতু তোমরা আমাকে কন্‌ফিডেন্সে নিচ্ছ না! বেশ বোঝা যায়, মাস্টারমশাই নিজেও নিজের স্মৃতির উপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না। আশঙ্কা হয়েছিল—নিজের অজান্তেই তিনি খুনগুলো করেছেন। আই মীন, ছ'তারিখের কাগজ পড়েই হয়তো একথা মনে হয়। তাই ছয় তারিখে ঐ আপাত-অসঙ্গত কথাটা লেখা—"সকাল আটটা দশ: খবরের কাগজ ক্রয়।"

আধঘণ্টা চিন্তা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন, তাই "পেন্‌সিল খোঁজা, পাইলাম না!" ওঁর হয়তো একটু একটু মনে পড়ছিল—পেন্‌সিল কাটতে গিয়ে হাত কাটেনি। কাউকে খুন করতে গিয়েই ওভাবে হাতটা কেটেছে। কিন্তু কে সে? ওঁর মনে পড়েনি। স্থির করেছিলেন, আর স্মৃতির উপর নির্ভর করবেন না। চন্দননগরে যাচ্ছিলেন তিনি—সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রতি দশ মিনিট অন্তর ডায়েরিতে লিখবেন, কখন কী করছেন। যাতে পরদিন যদি দেখেন চন্দননগরে কেউ খুন হয়েছে তখন স্মৃতিনির্ভর সমাধান নয়, ডায়েরির মাধ্যমে উনি জানতে পারবেন—হত্যামুহূর্তে তিনি ঠিক কোথায়, কী করছিলেন। অথচ ভুলোমানুষের মতো যাবার সময় ডায়েরিটা ফেলে যান।

ডক্টর দে বললেন, তাহলে তিনি আমাকে কেন মিছে কথা বলে গেলেন? কেন বললেন, শ্রীরামপুর যাচ্ছি!

—'গিল্ট কন্‌শাস্‌' মাইণ্ডের জন্য। তিনি যে তখন নিজেই জানেন না, তিনিই ঐ 'হোমোসাইডাল ম্যানিয়াক্‌' কি না। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে বাপি! তুমি এবার থানায় গিয়ে রিপোর্ট কর।...ভাবছ কেন? তুমি তো শুধু বলবে যে, তোমার বাড়ি থেকে একজন বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধ নিখোঁজ হয়েছেন। আর তো কিছু বলবে না তুমি।...না হয় চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

দাশরথী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে মিনিট-খানেক অপেক্ষা করেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ভগবান আমার প্রার্থনাটা শুনলেন না তাহলে?

মৌ যেন ছোট ছেলেকে আদর করছে। বাপের মাথায় ব্যাকব্রাশ চুলগুলোর উপর হাত বুলিয়ে সেও ধরা-গলায় প্রশ্ন করে, কী? কী প্রার্থনা করছিলে এ কয়দিন?

মেয়ের চোখে চোখ রেখে প্রৌঢ় লোকটি বলে ওঠেন, একটা মোটর অ্যাকসিডেন্ট...মাস্টার মশাই...ইন্সট্যান্ট ডেথ!

প্রমীলা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। তিনি জানতেন, ঐ বৃদ্ধ ছিলেন তাঁর বিকল শ্বশুর।

দশ

তের তারিখ সকাল আটটা।

আজও ব্রেকফাস্ট-টেবিলে এসে কৌশিক দেখে চতুর্থ চেয়ারখানি শূন্যগর্ভ। বললে, কী ব্যাপার? বাসুমামু এখনো ফেরেননি?

রানীদেবী টোস্টে জ্যাম মাখাচ্ছিলেন। বললেন, ফিরেছেন। ঘণ্টাখানেক আগে। স্টাডি-রুমে ঢুকেছেন।

সুজাতা বলে, ডেকে আনি ?

রাণী বলেন, না থাক। আমিই যাচ্ছি—

—কেন ? আপনি কেন আবার কষ্ট করবেন ?

রাণী তাঁর হুইল-চেয়ারে ইতিমধ্যেই একটা পাক মেরেছেন। থমকে থেমে গিয়ে বলেন, তোমাদের মামুর ভাষায় 'নাইন্টি-নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট চান্স'—চতুর্থ চিঠিখানা এসেছে।

কৌশিক চমকে ওঠে। বলে, মানে ? আপনি কী করে জানলেন ?

—আমি একে ব্যারিস্টারের বউ তার উপর গোয়েন্দার মামী। আমাকেও একটু একটু ডিডাকশান করতে হয় কৌশিক। উনি সব বিষয়েই ওভার-পাঙ্কুয়াল। ঘড়ি ধরে সাড়ে ছয়টায় মর্নিং-ওয়াকে গেলেন, কিন্তু এক ঘণ্টা বেড়ালেন না। ফিরে এলেন সাতটায়। ঢুকে গেলেন স্টাডি-রুমে। সেখানে সচরাচর মিনিট পনের থাকেন। আজ আছেন এক ঘণ্টার উপর।

সুজাতা বলে, তাই যদি হয়, তবে আপনাকেই যে চাকা-দেওয়া গাড়িতে ডাকতে যেতে হবে তার মানেটা কি ?

—বুঝলে না ? স্কাউনড্রেলটা এবার আরও অবমাননাকর ভাষায় লিখেছে। মহাদেবের ত্রিনয়ন থেকে যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হয় তখন ত্রিনয়নী শিবানীই তাঁকে ঠাণ্ডা করতে পারেন।

সুজাতা ও কৌশিক বসল নিজ নিজ আসনে। রাণীদেবী তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে চলে এলেন স্টাডি-রুমে। দ্বারপ্রান্ত থেকে বললেন, ব্রেকফাস্টে আসবে না ?

বাসু-সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, এগিয়ে এস। দেখ, তোমার কর্তার রাইভাল্-টার খানদানি বদনখানা !

মেলে ধরলেন সংবাদপত্রটা।

প্রথম পাতায় শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর একটি আলোকচিত্র। নিরীহ গোবেচারী ইস্কুলমাস্টার-মার্কা চেহারা। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী—যেটুকু সংগৃহীত হয়েছে এ পর্যন্ত—তা প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়েছে :

হেমাঙ্গিনী বয়েজ স্কুলের থার্ড মাস্টার। অঙ্কের টীচার ছিলেন। রুক্ষ-মেজাজী। এ পর্যন্ত তিনবার তিনি মানুষ খুনের চেষ্টা করেছেন এ তথ্য প্রতিষ্ঠিত। তিনবারই গলা টিপে। পরে তাঁর চাকরি যায়। মানসিক চিকিৎসালয়ে বছর দুই ছিলেন। যে মানসিক চিকিৎসালয়ে বন্দী ছিলেন তাঁর ডাক্তারের ইন্টারভ্যু নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে বৃদ্ধ 'মেগালোম্যানিয়াক'! মনে করতেন তিনি ছত্রপতি শিবাজী অথবা চিতোরের রাণাপ্রতাপের পরিবারের এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। সমাজ-সংসার এটা বুঝতে পারছে না। এটাই তাঁর

পাগলামি। ঐ সঙ্গে ছিল মৃগীরোগ ও 'ক্রনিক অ্যামনেশিয়া'—দীর্ঘস্থায়ী 'অস্মার রোগ'—অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিশেষ সময়ের স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যাওয়া। গোয়েন্দা বিভাগ ও আরক্ষ বিভাগের মতে সাম্প্রতিক কালের তিন তিনটি বীভৎস খুনের ইনিই হচ্ছেন নায়ক। প্রথমে আসানসোলের অশ্বর আঢ্য, তারপর বর্ধমানের বনানী ব্যানার্জি এবং শেষে চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়। ঐ তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের পরেই আততায়ী নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর পরিধানে ছিল… ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাণীর প্রত্যাবর্তনে দেরি হচ্ছে দেখে কৌশিক ও সুজাতাও গুটিগুটি এসে জুটেছে।

টোস্ট-ডিম-কফির কথা আর কারও মনেই রইল না। তিন-চারখানি কাগজ ওঁরা ভাগাভাগি করে পড়তে থাকেন।

রাণী বলেন, তোমাদের বিশ্বাস হয়?

কৌশিক বললে, বলা কঠিন। লোকটা ব্যাগে করে বই ফিরি করত—আসনসোল ও চন্দননগরে হয়তো সে উপস্থিত ছিল। এছাড়া তো সবই খবরের কাগজের রিপোর্টারের আপ্তবাক্য।

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু তুলে নিয়ে আত্মপরিচয় দিতেই ও প্রান্ত থেকে রবি বোস বলে, গুড-মর্নিং স্যার। খবরের কাগজ দেখেছেন? আততায়ীর ছবি?

—দেখেছি। কিন্তু এভিডেন্স কোথায়? লোকটার একমাত্র অপরাধ তো দেখছি বই ফিরি করা।

—না স্যার। ক্লিয়ার কেস্। এভিডেন্স সূর্যোদয়ের মতো স্পষ্ট। এখনি আসছি আমি।

রবি বসুর কাছ থেকে বিস্তারিত অনেক কিছু জানা গেল। ঐ শিবাজী প্রতাপ চক্রোত্তির পূর্ব-ইতিহাস। অনেকটাই অবশ্য এখনো কুয়াশা ঢাকা।

গতকাল সন্ধ্যা ছটা নাগাদ বিডন স্ট্রীট থানাতে এক ডাক্তার ভদ্রলোক আর তাঁর কন্যা মিসিং স্কোয়াডে একটা এজাহার দিতে আসেন। হারিয়েছেন একজন বুড়ো মানুষ, ওঁর বাড়ির তিনতলার চিলে-কোঠার ঘরে ভাড়া ছিলেন। একাই। তিনকুলে তাঁর কেউ নেই। জগদ্ধাত্রী পূজার দিন চন্দননগর যান, তারপর থেকে নিখোঁজ। তাঁর বিবরণ এবং তিনি ফেরি করে বই বেচতেন শুনে থানা অফিসার সন্দিগ্ধ হন। লালবাজারে জানান আর রবিকেও টেলিফোন করেন, কারণ প্রতিটি থানায় জানানো হয়েছিল, রবি বোস ঐ 'এ বি. সি-হত্যা' রহস্যের 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি'। রবি বারবার বাসু-সাহেবকে টেলিফোনে

খবর দেবার চেষ্টা করে কিন্তু টেলিফোনে কিছুতেই লাইন পায় না। ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টার বরাট বারবার তাগাদা দেওয়ায় তাকে যৌথ তদন্তে যেতে হয়।

ডাক্তার দাশরথীর কাছ থেকে ওঁর পূর্ব-ইতিহাস যা জানা গেছে তার বেশির ভাগই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। বাড়তি খবর—যেটা প্রকাশ করা হয়নি, তা বৃদ্ধের এমপ্লয়ারের পরিচয়। পণ্ডিচেরীর একটি আশ্রম ওঁকে এই চাকরিটি দিয়েছিলেন। পার্সেলে বই আসত। মাসে মাসে মনি-অর্ডারে ওঁর মাহিনা আসত। রবি আর ইন্সপেক্টার বরাট ওঁর ঘরটা সার্চ করে। ওঁর ঘরের একটি আলমারিতে থরে থরেপ্যাক করা বই ছিল। সবই ধর্ম বা ধর্ম সংক্রান্ত সাহিত্যপুস্তক। সর্বসমেত একশ তেরটি। তার ভিতর প্যাকেট না খোলা একটি বাণ্ডিলে পাওয়া গেছে একটি মারাত্মক এভিডেন্স। 'সুকুমার সমগ্র' রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড। তার তিনশ-আশি নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ব্লেড দিয়ে নিপুণভাবে দুখানি ছবি কেটে বার করা। কী ছবি ছিল জানা গেছে। অন্য একটি কপি দেখে। উপরের ছবিটি 'ল্যাংডাথেরিয়ামের' এবং নিচে 'ব্যাচাবাথেরিষাম' আর 'চিল্লানোসরাসের' ছবি। শেষের ছবি দুটি ব্রেড দিযে যেভাবে কাটা তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায যে, সে দুটিই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে সরাসরি আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছিল। তৃতীয ছবিটি 'L'-অক্ষব দিয়ে। সেটা কেন কাটা হয়েছে বোঝা যাযনি। আবও একটি মারাত্মক এভিডেন্স। ওঁর টেবিলে ছিল দামী একটা টাইপ-রাইটার। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ যে, ঐ যন্ত্রটি দিয়েই তিনখানি চিঠি টাইপ করা।

সব কিছু এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করে ইন্সপেক্টর বরাট নিয়ে যান। রবি প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল পি. কে বাসু সাহেবকে না জানিয়ে ঐ সব বই, টাইপ-রাইটার, ওঁর কাপড জামা ইত্যাদি সরানো-নডানো উচিত নয়, কারণ আই. জি. ক্রাইম সাহেবের স্পষ্ট নির্দেশ আছে দুটি টীম সমান্তরালে কাজ করবে, একে অপরকে সাহায্য করবে।

তার জবাবে ইন্সপেক্টর বরাট বলেন, এখন পরিস্থিতিটা নাকি পাল্টে গেছে! বাসু-সাহেব সবই দেখতে পাবেন আদালতে। যখন পিপল্স্ এক্সিবিট হিসাবে সেগুলি দাখিল করা হবে।

বাসু প্রশ্ন করেন, ঐ বুড়োটাকে এখনো ধরা যায়নি?

—না। আজই তার ছবি ছাপা হয়েছে কাগজে। আজ সন্ধ্যায় টিভিতেও দেখানো হবে। বিকৃতমস্তিষ্কের মানুষ। পকেটে টাকা পয়সা বোধহয় সামান্যই আছে। আমার তো ধারণা ওকে ধরা এখন—

বাসু-সাহেব বলেন, 'ছেলেখেলা!'

রবি হাসল। বলল, অনেকটা তাই স্যার! আমরা তো তাই আশা করছি· দুই কি তিন দিন।

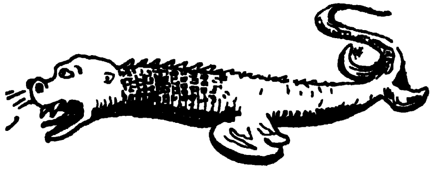

বাস্তবে ব্যাপারটা হল উল্টো। একটার পর একটা বিশ্রি ঘটনা! মারাত্মক ও বেদনাদায়ক। রবি বোসের ঘোষণা অনুসারে তিন দিনের মধ্যে লোকটা আদৌ ধরা পড়ল না—কিন্তু সাতজন নিরীহ লোক গণধোলাইয়ের শিকার হল। তাদের অপরাধ—তাদের দেহাকৃতি এবং জীবিকা ঐ অজ্ঞাত আততায়ীর মতো। ঐ সাতজনের মধ্যে দুজন মারাই গেল। তাদের একজন ফিরি করত ধূপকাঠি, দ্বিতীয়জন বেচত না, কিনত—পুরনো খবরের কাগজ!

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বেতারে বিবৃতি দিলেন। দূরদর্শনে উপস্থিত হয়ে বিশেষ ঘোষণায় অতি উৎসাহী জনগণকে অনুরোধ করলেন—যা করণীয় তা পুলিসকেই করতে দিন। সরকার জনগণের সহযোগিতা চান—নিশ্চয়ই চান—তবে সীমিত ক্ষেত্রে। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়লে জনগণ যেন অনুগ্রহ করে থানায় খবর দেন। সরকার জনগণের কাছে আর কোন সক্রিয় সাহায্য কামনা করছেন না।

এতে লাভবান হল কিছু সাময়িক পত্রিকা—যারা মুখরোচক স্টাণ্ট নিউজ ছাপাতে ওস্তাদ। পত্রিকার চিঠিপত্র-বিভাগের বৃকোদর অংশ দখল করল 'এ. বি. সি · হত্যারহস্য'। কাগজ খুলে কেউ দেখতে চায় না জরুরী খবরগুলো · ভারত এশিয়াডে কত নিচে নামল, প্রধানমন্ত্রীকে কী জাতের সম্বর্ধনা করা হল অথবা পূর্তমন্ত্রী কোন মূর্তিকে কবে মাল্যভূষিত করলেন। সকলেই সর্বপ্রথমে জানতে চায় : লোকটা ধরা পড়েছে কি না।

এই যখন সারা দেশের অবস্থা তখনই ডাকযোগে এসে পৌছালো সেই রহস্যময়ী হত্যাবিলাসীর চতুর্থ প্রেমপত্র। এবারও খামের উপর ভুল ঠিকানা। পোস্টাল জোনটায় একটিমাত্র ভ্রান্তি ; প্রথম সংখ্যাটা 'সাত'-এর বদলে 'এক'। অর্থাৎ পোস্টাল জোন : 100053। চিঠিখানা চন্দননগরের ডাকঘরের ছাপ নিয়ে চলে গিয়েছিল শ্রীনগর। সেখান থেকে পুনর্নির্দেশিত হয়ে বাসু-সাহেবের হাতে এসে পৌছালো ষোলো তারিখে। একই রকম খাম, কাগজ, একপিঠে আঁক-কষা, অপর পিঠে—না, এবার দুটি ছবি। দুটিই একরঙা লাইন ব্লক। অন্য কোন বই থেকে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা :

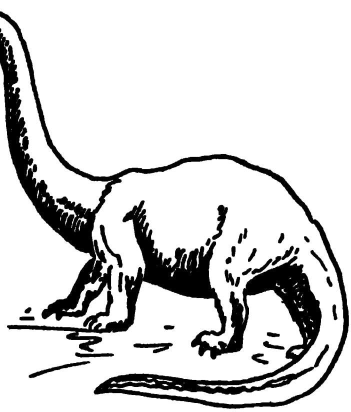

D-FOR DIPLODOCUSAIH NAMAH!

পি কে· বাসু বার-অ্যাট-ল্যাংড়াথেরিয়ামেষু,

মহাশয়,

কী মর্মবিদারক দৃশ্য! বিশালকায় ব্যারিস্টার ল্যাংডাথেরিয়ামকে একজন সামান্য মানুষ—যাহাকে কেহই চেনে না, যাহার ক্ষমতাকে কেহই স্বীকৃতি দেয় না—গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

অহেতুক জীবহত্যা করিতেছেন কেন? সংবাদপত্রে একটি বিবৃত দিয়া নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয় নহে কি? আপনার দম্ভ কি এতই আকাশচুম্বী? ঈশ্বর আপনাকে সুমতি দিন, এই কামনা।

D FOR DIGHA!

তাং : পঁচিশে ডিসেম্বর। ইতি—D. E. F.

এগার

পরদিন সকালে রবি বোস এসে হাজির। বললে, এক এক সময় ইচ্ছে করে রিজাইন দিয়ে ঐ নরক থেকে বেরিয়ে আসি। পুলিসের চাকরি তারাই করে যারা গতজন্মে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছিল!

বাসু-সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, কেন হে! এমন ক্ষেপে গেলে কেন?

রবি বুঝিয়ে বলে তার অন্তর্দাহের ইতিকথা। গতকালই সন্ধ্যায় বাসু-সাহেবের ঐ চতুর্থ পত্রখানি তার হস্তগত হয়েছিল। এবার বাসু-সাহেব নিজে যাননি,রবিকে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ও তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দা বিভাগে বরাট-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এবং অনুরোধ করে—ঐ দিনই আবার একটা কন্‌ফারেন্সের ব্যবস্থা করতে। ডক্টর ব্যানার্জি, ডক্টর মিত্র এবং বাসু-সাহেবকে ঐ চতুর্থ পত্রটি বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিতে। বরাট সরাসরি অস্বীকার করেন। বলেন, ও সব থিওরেটিক্যাল বিশেষজ্ঞের পর্যায় পার হয়ে গেছে। এখন শুধু অ্যাক্‌শন! সে কাজ গোয়েন্দা বিভাগ যথারীতি করছে। ঐ তিনজন বিশেষজ্ঞকে নাকি ইতিপূর্বেই ফর্মাল ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তারপর রবি স্বয়ং আই. জি. ক্রাইমের সঙ্গে ল'ডন স্ট্রীটে গিয়ে দেখা করেছিল। তিনি বলেছেন, অফিশিয়ালি স্পিকিং—বরাট, এরই যা কিছু করণীয়। সে যেভাবে অগ্রসর হতে চায়, হোক। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাসু-সাহেবকে একটি ধন্যবাদপত্র পাঠিয়েছেন।

বাসু-সাহেব পত্রখানি নিয়ে পড়লেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, মিস্টার বরাটকে বলেছিলে যে, আমি ঐ সীজ করা জিনিসগুলো দেখতে চাই?

– বলেছিলাম। তাতে উনি বললেন, একটিমাত্র শর্তে উনি তা আপনাকে দেখতে দেবেন। যদি আপনি কথা দেন, লোকটা ধরা পড়লে আপনি তার ডিফেন্স কাউন্সেল হবেন না।

—অল্ রাইট। তখনই না হয় দেখব।

– তখনই মানে? কখন?

– যখন ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে আদালতে দাঁড়াব। পিপল্‌স্ এক্সিবিট হিসাবে সবই ওরা আমাকে দেখাতে বাধ্য হবে।

—তার মানে আপনি ঐ লোকটার

—হ্যাঁ রবি। আমি চেষ্টা করব প্রমাণ করতে যে, সে সজ্ঞানে হত্যা করেনি! সে পাগল!

—আপনি তাই মনে করেন?

—আমি তাই মনে করি। মানসিক চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের রিপোর্টটা

দেখনি? ও 'অস্মার' রোগে ভুগছিল। ওর স্মৃতি মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। তখন যদি সে কাউকে·· আর তাছাড়া বনানীর 'ল্যাভার' হিসাবে ঐ বুড়োটাকে তুমিই কি কল্পনা করতে পারছ?

—না। কিন্তু ওর ঘরের ঐ টাইপ-রাইটার? আর পাতা-কাটা ঐ 'সুকুমার রচনা সংগ্রহ'?

—ডাক্তার দাশরথী দের বয়স কত? তার ব্যাকগ্রাউণ্ড কী? তুমি কি খোঁজ নিয়ে জেনেছ, ঐ অঙ্কের মাস্টার প্রাইভেট ট্যুইশানি করতেন কি না? ওঁর ঘরে কোনও কলেজের অল্পবয়সী ছেলে সন্ধ্যার পর এসে ওঁর প্রাইভেট টুইশানির ক্লাস করত কিনা? এলে, সে টাইপ-রাইটিং জানে কি না? টাইপরাইটারটা ব্যবহার করত কি না?

—মাই গড! এ সব কথা তো ···

—গুডবাই মাই ফ্রেণ্ড! আজ তোমার 'বস'-এর কাছে রিপোর্ট কর—আমার সহকারী হিসাবে আর তোমাকে কাজ করতে হবে না। আই ফায়ার য়ু! তার মানে এ নয় যে, আমি তোমার উপর রাগ করেছি। প্রয়োজনে তোমাকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু এরপর থেকে তুমি আর আমি ভিন্ন ক্যাম্পে। তোমার চাকরির নিরাপত্তাটাও তো আমাকে দেখতে হবে।

রবি বোস এগিয়ে এসে বাসু-সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ডাক্তার দাশরথী দে বাড়ি ছিলেন না। রোগী দেখতে বেরিয়েছেন। প্রমীলা ওঁদের সাদরে বসতে দিলেন। প্রমীলা এবং মৌ দুজনেই বাসু-সাহেবকে ভালভাবে চেনেন—মানে ব্যক্তিগতভাবে নয়, তাঁর কীর্তিকাহিনীর জন্য। প্রমীলা বললেন, উনি বাড়িতে নেই তাতে কি হয়েছে, আপনি ঘরটা যদি দেখতে চান

—ঘরটা তো দেখবই। তার আগে বলুন, কাগজে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তার বাইরে ওঁর সম্বন্ধে কী জানেন? ··আচ্ছা, আমি বরং একে একে প্রশ্ন করে যাই—উনি কবে প্রথম আসেন, কী ভাবে? তার আগে কোথায় ছিলেন?

—এ বাড়িতে উনি এসেছেন বছর খানেক আগে। ওঁর ডিসপেনসারিতে একদিন এসেছিলেন একটা চাকরির খোঁজে। উনি চিনতে পারেন। সে সময়

মাস্টারমশাই ছিলেন বেকার। কোথায় থাকতেন জানি না। তবে উনি একাধিক ডিস্পেনসারিতে কম্পাউণ্ডারের কাজ করেছেন। যদিও পাস-করা কম্পাউণ্ডার নন। মাঝে কিছুদিন নাকি কোন এক ছাপাখানায় প্রুফ-রীডারের কাজও করেছেন। তখন ঐ প্রেসেই থাকতেন। কোথাও বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি। বারে বারে চাকরি খুইয়েছেন। হাইকোর্টের কাছে পথের ধারে বসে টাপিংও করেছিলেন কিছুদিন—কিন্তু তাতে পেট চলে না। মাথা গোঁজার আশ্রয়ও তখন ছিল না।

—উনি বারে বারে চাকরি খুইযেছেন কেন? ওঁর পাগলামীর জন্য?

—হয়তো তাই।

মৌ উপরপড়া হয়ে বললে, গল্পচ্ছলে মাস্টারমশাই আমাকে দুটি কেস-হিস্ট্রি বলেছিলেন। সে দুবার কেন তাঁর চাকরি যায়। একবার একটি ডিসপেন-সারিতে ক্যাশ থেকে কিছু টাকা চুরি যায়। দোকানের সবাই বলেছিল, তারা টাকা নেয়নি, আর মাস্টারমশায়ের বক্তব্য ছিল—আমার মনে নেই! দ্বিতীয়বার প্রেস-এর চাকরি খোওয়া যায় সম্পূর্ণ অন্য কারণে। একটি অঙ্কের বই ছাপা হচ্ছিল। উনি প্রুফ-রীডার। খুব তর্ক বাধিয়েছিলেন লেখকের সঙ্গে। ওঁর মতে লেখকটি অঙ্কের কিছুই বুঝতেন না। যেভাবে তিনি পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কগুলি কষেছিলেন তার চেয়ে সহজ পদ্ধতিতে সেগুলি নাকি কষা যায়। কষে নাকি দেখিয়েও দিয়েছিলেন। লেখক ছিলেন অঙ্কের একজন অধ্যাপক। তর্কাতর্কির সময় তিনি নাকি ঐ অধ্যাপকের গলা টিপে ধরেন। ফলে চাকরি খোয়ান।

—উনি কি টাইপ রাইটিং জানতেন?

—হ্যাঁ। বেশ ভালই। আমি ওঁর কাছেই শিখেছিলাম।

—শিশু সাহিত্য পড়তেন? পড়তে ভালবাসতেন?

—যথেষ্ট। বরং বড়দের চেয়ে শিশু ও কিশোর সাহিত্যই বেশি করে পড়তেন।

বাসু হঠাৎ মৌ-এর দিকে ফিরে বললেন, তুমি এদুটি শব্দ কখনো শুনেছ? 'ব্যাচারাথেরিয়াম্' আর 'চিল্লানোসরাস্'?

এমন অদ্ভুত প্রশ্নটা শুনে মৌ একটু থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। সুকুমার রায়ের একটা হাসির গল্পের দুটি নাম। বইটিতে ছবিও আছে ঐ জীবের। চিল্লানোসরাস্ ব্যাচারাথেরিয়ামকে কামড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামড়ালো না। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাসু বললেন, ঐ গল্পটা, বা ঐ জন্তু দুটোর নাম নিয়ে কখনো মাস্টারমশায়ের সঙ্গে তোমার কোন আলোচনা হয়েছে? তোমার মনে পড়ে?

মৌ একটু ভেবে নিয়ে বললে, মনে পড়ে না। হঠাৎ ঐ জন্তু দুটো…

বাসু-সাহেব প্রমীলা দেবীকে বললেন, চলুন, এবার চিলে-কোঠা ঘরটা দেখি।

ঘরটা উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। আলমারি হাট করে খোলা। বই বা টাইপরাইটার নেই। মাস্টারমশায়ের কাগজপত্র, জামাকাপড়, কলম-কলমদানি-পিনকুশান-পেপারওয়েট কিচ্ছু নেই। এ ঘরে এখন তল্লাসী করা নিরর্থক। ওঁরা নেমে আসছিলেন, হঠাৎ বাসু-সাহেব দেওয়ালের একটা অংশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐখানে দীর্ঘদিন একখানা ছবি টাঙানো ছিল, ফ্রেমে বাঁধানো। মাস্টারমশায়ের নিশ্চয়। সেটাই আপনারা খুলে পুলিসকে দিয়েছেন?

মা-মেয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। প্রমীলা জবাব দেবার আগেই মৌ বললে, না। আমাদের ফ্যামিলি-অ্যালবাম থেকে খুলে মাস্টারমশায়ের ছবিখানি দেওয়া হয়েছে।

—আই সী। তাহলে ওখানে যে ফটোটা ছিল, সেটা…কার ফটো ছিল ওখানে? ফটো না ছবি?

মৌই জবাব দিল। ফটোটা কার তা শুনে বাসু বলেন, আই সী। কাগজে ওঁর নামে যেসব কথা বেরিয়েছে তারপর ছবিখানা নামিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সরিয়েছেন কে? আপনারা কেউ না শিবাজীবাবু নিজেই?

—নামিয়ে ছিলেন মাস্টারমশাই। সরিয়ে রেখেছেন মা।

—আই সী!

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু ফিরে এসেছেন। দ্বিতলে কুস্‌মির মায়ের কাছে খবর পেয়ে উঠে এসেছেন চিলে-কোঠার ঘরে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বনানীর প্রেমিক হওয়ার সম্ভাবনা অল্প।

ওঁরা আবার ফিরে গিয়ে দ্বিতলের ঘরে বসলেন।

ডাক্তার-সাহেব আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হলেন। বিশেষ করে মাস্টারমশায়ের বর্তমান নিয়োগ-কর্তা সম্বন্ধে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পণ্ডিচেরী থেকে একখানি চিঠি আসে 'মাতৃসদন' থেকে। কী এক মহারাজ শিবাজীবাবুকে পত্র লেখেন। পত্রটা, বস্তুত গোটা ফাইলটাই পুলিসে 'সীজ' করেছে। তবে প্রথম চিঠিখানির বয়ান ডাক্তারবাবুর স্পষ্ট মনে আছে। মহারাজ জানিয়েছিলেন, তাঁর এক ভক্ত—যিনি নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক—কিন্তু শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর ছাত্র—মহারাজকে তাঁর মাস্টারমশায়ের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। 'মাতৃসদন' ওঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিনিময়ে শিবাজীবাবুকেও মাতৃসদনের সেবা করতে হবে। ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মপুস্তক বিক্রয় করে আসতে হবে। সাড়ে চারশ টাকা

মাস মাহিনায়। মাস্টারমশাই সাগ্রহে চাকরিটি গ্রহণ করেন। মাসে মাসে মনি-অর্ডারে টাকা আসত

—মনি-অর্ডারে ? চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্‌-এ নয় ?

—না। বরাবর মনি-অর্ডারে টাকা আসতে দেখেছি। আর মাঝে মাঝে পোস্টাল পার্সেলে বই।

—মাতৃসদনের ঠিকানাটা দিন দেখি ?

দেখা গেল, ওঁদের কাছে তা নেই। ঐ ফাইলেই সব কিছু ছিল। ডাক্তারবাবু ওদের লেটার-হেড প্যাডের চিঠি বহুবার দেখেছেন। অপ্রয়োজনবোধে ঠিকানা টুকে রাখেননি।

ইতিমধ্যে চা-পানের পাট চুকেছে। বাসু-সাহেব গাত্রোত্থানের চেষ্টা করতেই ডাক্তারবাবু বললেন, একটা অনুরোধ করব স্যার ?

—কী বলুন ?

—মাস্টারমশাই দু-চার দিনের মধ্যে নিশ্চয় ধরা পড়বেন। আপনি কি তাঁর ডিফেন্সটা নিতে পারেন না ? ব্যারিস্টার দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি অবশ্য আমার নেই। কিন্তু ওঁর কয়েকজন ধনী ছাত্রকে আমি চিনি—মানে আমারই সব ক্লাস-ফ্রেণ্ড। আমরা চাঁদা তুলে

বাসু বলেন, দেখুন ডক্টর দে, টাকার জন্য আটকাবে না, কিন্তু কেসটা আমি নেব কি না তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের উপর।

—জানি। শুনেছি আপনার কথা। আপনি নিজে যাকে মনে করেন 'নির্দোষ' তার কেসটি আপনি গ্রহণ করেন। যাকে মনে করেন দোষী, তাকে পরামর্শ দেন 'গিলটি প্লীড' করতে। কিন্তু এ কেসটা যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, বাসু-সাহেব। মাস্টারমশাই তো নিজেই জানেন না—তিনি 'গিলটি' না 'নট গিলটি'।

বাসু বললেন, আগে তিনি ধরা পড়ুন। তবে আপনার অনুরোধটা আমার মনে থাকবে।

পরদিন সকালে বাসু-সাহেব চন্দননগরে একটা ফোন করে জানালেন যে, তিনি বিকেলে ওখানে আসবেন। টেলিফোন ধরেছিলেন বিকাশবাবু। তিনি আগ্রহ দেখালেন, বললেন, তাহলে মধ্যাহ্ন আহারটা এখানেই করে যাবেন, স্যার। বিকালের বদলে এবেলাই—

—না। কারণ আমার একটি লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি গিয়ে পৌঁছাব বিকেল চারটে নাগাদ। মিস গাঙ্গুলীকে কি তখন পাওয়া যাবে ?

—আমি খবর পাঠাচ্ছি।

—তোমার দিদি কেমন আছেন ?

—দিন দিন খারাপের দিকে৷

বাসু-সাহেব এবার রিভলবারটা সঙ্গে নিলেন কিনা সুজাতা জানে না ; কিন্তু ওঁর ক্যামেরা, টেলি-ফটো লেন্স, বাইনোকুলার, কম্পাস ও মাপবার ফিতে যে নিয়েছেন তা টের পেল। এসব সরঞ্জামের কী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হল না। ইতিমধ্যে কৌশিক আসানসোল থেকে যে ফটো তুলে এনেছে সেগুলিও সঙ্গে নিয়েছেন।

বিকাশ ওদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালো বৈঠকখানায়। অনিতা গাঙ্গুলীও ছিল। বাসু ওঁর সব সরঞ্জাম টেবিলে সাজিয়ে রেখে প্রথমেই স্টাডি-রুমটার মাপজোক নিলেন। কত লম্বা, কত চওড়া, জানলাগুলি মেঝে থেকে কত উপরে। ওঁর নির্দেশ মতো সুজাতা একটা খাতায় মাপগুলি লিখে নিল। গেট থেকে সদব দরজার দূরত্বটা মাপতে গিয়ে প্রাণান্ত হল কৌশিকের। দারোয়ান আর বলাই সাহায্য করল ওকে। বাড়িটার একগাদা ফটো নিলেন। যে বেঞ্চিটার নিচে মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তারও বেশ কয়েকটি ফটো। বালি-য়াড়ির উপর থেকে টেলিফোটো লেন্স লাগিয়ে দূর থেকে অনেকগুলি ফটো।

কারও সাহস হল না প্রশ্ন করতে এসব কোন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে লাগবে। বারে বারে বাইনোকুলার দিয়ে গঙ্গার ওপারে কিছু খুঁজলেন তিনি। কম্পাস বার করে নির্ধারণ করলেন বাড়িটি ঠিক পূর্বমুখী নয়—সাত ডিগ্রি দক্ষিণপূর্ব দিকে সরে আছে।

এরপর অনিতা এসে বলল, আপনারা ভিতরে এসে বসুন। আফটারনুন টি রেডি।

ওঁরা ঘরে এসে বসলেন। বাসু বললে, চা নিশ্চয়ই খাব, কিন্তু এ যে হাই-টি !

এরপর কিছুক্ষণ শিবাজী চক্রবর্তীর বিষয়ে আলোচনা হল। কী অপরিসীম আশ্চর্য ! লোকটা এখনো ধরা পড়লো না। পুলিস কোন কর্মের নয়। বাসু খবরটা প্রকাশ করলেন—ইতিমধ্যে উনি চতুর্থ পত্রটি পেয়েছেন—'D FOR DIGHA' !

বিকাশ এবং অনিতা দুজনেই আঁৎকে ওঠে। বিকাশ বলে, সর্বনাশ ! তারিখটা ?

—পঁচিশে ডিসেম্বর !

অনিতা বললে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান দিয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে।

বিকাশ বলল, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ইচ্ছা করেই দিয়েছে। জগদ্ধাত্রী পূজায় যেমন চন্দননগরে ভীড় হয়, ঠিক তেমনি বড়দিনে ভীড় হয় দীঘাতে। 'ডি'

নাম বা উপাধির কে-কে আসবে পুলিস তা কেমন করে জানবে? আপনি কবে চিঠিটা পেলেন? কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন নিশ্চয়। কবে ছাপা হবে?

বাসু বলেন, এনি ডে। আজ বের হয়নি, কার পরশু বের হবে। তোমার দিদিকে কি খবরটা জানানো হয়েছে?

—না। ডাক্তার বলছে ম্যাক্সিমাম একমাস। কী দরকার?

—অসুখটা কী?

—ক্যানসার। ওঁকে বলা হয়েছে জামাইবাবু হঠাৎ বিশেষ কাজে দিল্লী যেতে বাধ্য হয়েছেন। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ফিরবেন।

বাসু-সাহেব অনিতার দিকে ফিরে বলেন, সেদিন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চটা কী জাতের ছিল? তুমি বলেছিলে, তিনি একটি 'রবীন্দ্র অভিধান' রচনা করছিলেন। তার মানেটা কী?

অনিতা ওঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। এটা শেষ পর্যন্ত একটি অভিধানের রূপ নিত। প্রতিটি শব্দ রবীন্দ্রনাথ কোথায়, কী অর্থে ব্যবহার করেছেন তার খতিয়ান।

—সেটা কী কাজে লাগবে?

—অনেক কাজে লাগতে পারে। ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করলাম, 'করো করো অপাবৃত হে সূর্য আলোক আবরণ'—এই পংক্তিটা রবীন্দ্রনাথ কবে, কোথায় এবং 'অপাবৃত' শব্দের কী অর্থে ব্যবহার করেছেন। আপনি বলতে পারেন?

—না। কোথায়?

—আমারও মুখস্ত নেই। কিন্তু অভিধান দেখে বলতে পারব। 'আলোক' 'সূর্য' কিম্বা 'অপাবৃত' এই তিনটে 'এন্ট্রি' যে কোন একটাতে পাওয়া যেতে পারে। এইটে 'অ'-ফাইল। এই দেখুন—

ফাইল থেকে দেখালো লেখা আছে :·"অপাবৃত—অনাবৃত। তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। ঈশ ১৫।। "করো করো অপাবৃত হে সূর্য আলোক আবরণ"।। জন্মদিনে/১৩/১১ই মাঘ/১৩৪৭ উদয়ন/সকাল"

—তার অর্থটা কী দাঁড়ালো?

—'জন্মদিনে' কবিতাগ্রন্থের তের নম্বর কবিতা। ১১ই মাঘ, ১৩৪৭ তারিখের সকালে 'উদয়ন'-এ বসে কবি ঐ পংক্তিটি রচনা করেছিলেন। 'অপাবৃত' শব্দের অর্থ 'অনাবৃত করা'। কবির ঐ পংক্তিটির মূল ভাবের উৎস হচ্ছে ঈশোপনিষদের পঞ্চদশ মন্ত্রটি, 'তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।'

বাসু বললেন, দারুণ কাজ করছিলেন তো ডক্টর চ্যাটার্জি! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি ঐ 'অপাবৃত' শব্দটা অন্য কোথাও ব্যবহার করেননি?

—হয়তো করেছেন। সেটা বোঝা যেত গ্রন্থটা সম্পূর্ণ হলে। কারণ উনি

প্রতিদিনই ছোট ছোট কাগজে এইসব নোট লিখে দিতেন, আর আমরা সেগুলি বিভিন্ন ফাইলে অভিধানের রীতিতে পর পর গেঁথে রাখতাম। কম্পাইলেশন শেষ হলে বোঝা যেত 'অপাবৃত' শব্দটা কবি কতবার, কোথায় কোথায় কী অর্থে ব্যবহার করেছেন।

এই সময় একজন য়ুনিফর্মধারী নার্স এসে অনিতাকে জানালো, মিসেস চ্যাটার্জি তাকে ডাকছেন। 'এক্সকুজ মি' বলে অনিতা উঠে গেল দ্বিতলে। একটু পরেই ফিরে এসে বাসু-সাহেবকে বলল, দিদি টের পেয়েছেন যে, আপনি এসেছেন। শুক্লা ওঁকে জানিয়েছে।

—শুক্লা কে ?

—এ।

মিসেস চ্যাটার্জির ডে-টাইম নার্স যুক্তকরে নমস্কার করল।

—উনি আপনার কীর্তি কাহিনীর কথা জানেন। বস্তুত উনি আপনার একজন 'ফ্যান'। আমাকে দিয়ে অনুরোধ করেছেন, যাবার আগে যেন আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান।

—তা আমার এখানকার কাজ তো মিটেছে। মাপজোক সবই নেওয়া হয়েছে। চল যাই—

বিকাশ বলে, কিন্তু স্টাডিরুমের মাপটা কোন্ কাজে লাগবে ?

বাসু হেসে বললেন, ট্রেড-সিক্রেট কি কেউ জানিয়ে দেয় ? চল, দোতলায় যাই।

বারো

মিসেস চ্যাটার্জির বয়সটা আন্দাজের বাইরে। 'কর্কটিকা-ডাস্টার' ওঁর তনুদেহের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা কৈশোরের স্বপ্ন, তারুণ্যের উদ্দামতা, যৌবনের নিভৃতকূজনের সব ইতিকথা লেপে মুছে দিয়েছে ! ব্ল্যাকবোর্ড ব্ল্যাঙ্ক ! কঙ্কালসার দেহটি বিরাট ডব্‌ল্-বেড শয্যায় অর্ধশায়িত। পিঠের দিকে একাধিক উপাধান। হাত দুটি সবল, কারণ যুক্তকরে নমস্কার করে অম্লান হেসে বললেন, 'ওয়েস্ট্-এর ওয়েস্ট' থেকে আজ প্রথম দেখলাম 'প্যারীম্যাসন্ অব দ্য ঈস্টকে।' বসুন।

প্রথম 'ওয়েস্ট'-এর স্বরান্ত এবং দ্বিতীয় 'ওয়েস্টে'র দীর্ঘায়ত উচ্চারণে বাসু-সাহেবের মনে হল—ঐ শয্যালীন মহিলাটি এক কালে বেণী দুলিয়ে স্কিপিং করতেন—কোনও কনভেন্ট স্কুলে। আর ওঁর অম্লান হাসিটি দেখে অনুভব করলেন—যন্ত্রণাদায়ক ক্যানসার রোগও পারেনি ওঁর সব কিছু মুছে দিতে। আরও মনে হল, ডক্টর চ্যাটার্জি 'প' অক্ষর পর্যন্তই লিখে গেছেন। 'ম' অক্ষরে উপনীত

হয়ে তিনি লিখে যাবার সময় পাননি : 'আমি 'মৃত্যু' চেয়ে বড়, এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে !'

বাসু-সাহেব ওঁর শয্যাপার্শ্বে বসে পড়লেন। কঙ্কালসার হাত দুটি তুলে নিয়ে বললেন, 'ওয়েস্টের ওয়েস্ট' কেন বলছেন মিসেস চ্যাটার্জি ? সূর্য তো প্রতিদিন অস্ত যায়, উদিত হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এই তো কদিন আগে জগদ্ধাত্রীর বিসর্জন হল। কিন্তু 'বিসর্জন' তো 'নেমেসিস্' নয়—'বি পূর্বক সৃজ্-ধাতু অনট্'—বিশেষ রূপে জন্ম নেওয়া। ধাতুটা 'সৃজ্'। বিসর্জনের মন্ত্র : পুনরাগমনায় চ।

মনে হল, ভারী তৃপ্তি পেলেন ভদ্রমহিলা। মিনিট খানেক চোখ বুজে স্থির থেকে বললেন, আমার নাম রমলা। আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

বাসু বলেন, তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, রমলা ?

—এখন হচ্ছে না। যখন 'স্প্যাজম্' আসে, তখন হয়। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা গোপন কথা আছে, বাসু-সাহেব। ওদেব যেতে বলুন।

বাসু এদিকে ফিরলেন। ঘর ছেড়ে একে একে সকলে বার হয়ে গেল। এমনকি শুক্লা, অনিতাও।

—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এখানে এসে বসুন।

বাসু ওঁর আদেশ তামিল করার পর রমলা দেবী বালিশের তলা থেকে একগোছা চাবি বের করে বললেন, ঐ গোদরেজ-এর আলমারিটা খুলুন। এইটা বাইরেব চাবি, এইটা সিক্রেট-ড্রয়ারের।

বাসু বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশমতো কাজ করার পর মহিলা বললেন, একটা চন্দন-কাঠেব বাক্স আছে না ? বাঁ দিকে। উপরে হাতির-দাঁতের কাজ-করা। পেযেছেন ? ওটা নিয়ে আসুন।

দেখা গেল তাতে খান কয়েক গিনি আছে। আর একটা ফর্দ। গহনার ফর্দ।

রমলা ওঁকে জানালেন—এই গহনাগুলি আছে ওঁর কলকাতার সেফ্-ডিপজিট ভল্টে। সব তাঁর স্ত্রীধন—বিবাহের যৌতুক, অথবা পরে উপহার পাওয়া, বা ক্রয় করা। বললেন, প্রতিটি গহনার পাশে তিনি এক-একজনের নাম লিখে সই করে দিতে চান, যাতে তাঁর অবর্তমানে···

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, এতদিন এসব করে রাখেননি কেন ?

তিনি যে মহিলাটির ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে নিজের অজান্তেই আবার 'আপনি'-তে ফিরে গেছেন, তা টের পাননি।

—উনি রাজী ছিলেন না। সুপারস্টিশান ! ওটা লিখলেই নাকি আমি মরে যাব। ওটা লেখা হয়নি, একথা যতদিন আমার মনে থাকবে ততদিন মনের জোরেই আমি নাকি বেঁচে থাকব ! আচ্ছা বলুন তো ! এসব নিছক পাগলামি নয় ? তাছাড়া এই যন্ত্রণা নিয়ে পঙ্গু হয়ে আমি কি বেঁচে থাকতে চাই ?

বাসু-সাহেবের মনে পড়ে গেল,—এ প্রশ্নটা তিনি জীবনে এই প্রথম শুনছেন না। সে প্রিয়জনটি কিন্তু ক্যান্সারে ভুগছিল না। উনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক কী করতে চাইছেন ?

—ঐ লিস্ট-এ প্রতিটি গহনা কাকে দিচ্ছি তা লিখে আমি সই করে দেব। কাগজখানা আপনার কাছে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর আমার গহনার ভাগ কীভাবে হবে তার বিলিব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। আর একথা আপনি ওঁকে জানাবেন না। উনি দিল্লী থেকে ফিরে আসতে আসতেই আমার যদি কিছু হয়ে যায়…

বাসু অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়লেন, উনি কবে ফিরছেন ? আপনাকে কিছু বলে গেছেন ?

—না। সে সময় আমার একটা ক্রাইসিস্ চলছিল। যাবার সময় দেখা করেও যেতে পারেনি। তবে দিল্লীতে পৌঁছে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট থেকে ওর রবীন্দ্র অভিধান বাবদে একটা 'গ্র্যাণ্ট' না 'রিসার্চ-স্কলারশিপ' দেবার সম্ভাবনা আছে, ও তাই নিয়ে দরবার করতে গেছে। ফিরতে কিছুদিন দেরী হবে। তার আগেই যদি…

এ সংবাদটা চমকপ্রদ বৈকি। দিল্লী থেকে স্বর্গীয় চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের পত্রপ্রেরণ। কিন্তু কৌতূহল দেখানো চলে না। বাসু বলেন, সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট-এর কোন ডিপার্টমেণ্ট ? রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে সেণ্টারের এত দরদ…

—এই দেখুন না।—অম্লানবদনে বালিশের তলা থেকে একটি খাম বার করে দিলেন।

খামের উপর টাইপ করে মিসেস্ রমলা চট্টোপাধ্যায়ের নাম-ঠিকানা। পোস্টাল ছাপটা পরিষ্কার নয়াদিল্লীর। বাসু ইতস্তত করে বলেন, ওঁর আপনাকে লেখা চিঠি আমি পড়ব ?

—এমন কিছু প্রেমপত্র নয়। আমাদের বিয়ে হয়েছে একুশ বছর আগে। পড়ুন।

খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা বার করলেন। টাইপ করা চিঠি। আদ্যন্ত ফরাসী ভাষায়। সম্বোধনেই হোঁচট খাবার অভিনয় করে বললেন, 'মঞ্চেরি' মানে ? আপনার আর এক নাম কি 'মঞ্চেরি' ?

হাত বাড়িয়ে খামটা ফেরত নিলেন রমলাদেবী। হাসতে হাসতে বলেন, 'মঞ্চেরি' নয়, Mon Cheri—ফরাসী শব্দ একটা। আদরের ডাক : 'আমার প্রিয়।' আদ্যোপান্ত চিঠিটাই ফরাসী ভাষায় লেখা।

বাসু বলেন, আপনারা কি ফরাসী ভাষায় প্রেমপত্র আদান-প্রদান করতেন ?

—উপায় কি ? আমি স্কুল-কলেজে পড়েছি পারীতে। আমার বাবা ছিলেন পারীর ইণ্ডিয়ান এম্ব্যাসীতে, ফরেন সার্ভিসে। ইংরাজীটা পরে শিখেছি। আর উনি যেটায় ডক্টরেট করেছেন সেই বাঙলা সামান্যই জানি। যাক্ কাজের কথায় আসুন। এ লিস্টটা বানিয়ে আপনি আমার এক্সিকিউটার হিসাবে কি…

—নিশ্চয়ই করব। বলুন আপনি একে একে।

লিস্টে পঁয়ত্রিশটা আইটেম! প্রত্যেকটি গহনার নিখুঁত বিবরণ ও ওজন উল্লিখিত। উনি একে একে বলে গেলেন—কে কোনটা পাবে। অনিতা পাবে হীরের নেকলেস্-ছড়া, আর মকরমুখী বালা। শুক্লা ছ-গাছা চুড়ি। উমা (বলাইয়ের স্ত্রী) মফচেনটা, বুধির-মা (ঝি) কানবালা, সীতা (দারোয়ানের ঘরওয়ালী) দুগাছা চুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশই বাসু-সাহেবের অপরিচিতা—তাদের বিশদ পরিচয়ও লিখে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, বিকাশবাবুর ভাবী বধূকে কিছু দিচ্ছেন না ?

—বাকি সম্পত্তিটাই তো তার। উনি যাবতীয় সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিয়েছেন। আমি আর কতদিন ? আর আমার একমাত্র ওয়ারিশ তো খোকনই, আই মীন, বিকাশ! দিন এবার, সই করে দিই।

বাসু বলেন, না! এখনই নয়। অন্তত দুজন সাক্ষীর সামনে সইটা করবেন। আমি সুজাতা আর বিকাশবাবুকে ডাকি বরং।

—বিকাশের বদলে অনিতাকে ডাকলে হয় না ?

—না। হয় না। অনিতা একজন 'বেনিফিশিয়ারি', মানে তাকেও আপনি কিছু দিচ্ছেন যে।

অগত্যা এরপর বিকাশ ও সুজাতাকে ডেকে উনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। সাক্ষী হিসাবে ওঁদের দুজনকে সই দিতে হবে। রমলা সই দিলেন। বাকি তিনজনও দিলেন। এরপর বাসু-সাহেব সুজাতাকে বলেন, ডক্টর চ্যাটার্জির স্টাডিরুমে একটা স্ট্যাম্প-প্যাড দেখেছি। ওটা নিয়ে এস। চারজনের টিপছাপও নিতে হবে।

বিকাশ বললে, টিপছাপের কী দরকার ? সই করেই দিলাম তো ?

বাসু তার দিকে তাকিয়ে বলেন, এম. এ. পাস করার পর কিছুদিন 'ল' পড়েছিলে বুঝি ?

—না তো! কেন ?

—লাখ টাকার উপর যার মূল্যমান তেমন দলিলে সইয়ের সঙ্গে টিপছাপও দিতে হয়। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাপ অ্যাক্ট, 1935, অ্যামেণ্ডেড ইন্ 1955, ধারার নং 135 (c).

বিকাশ আর উচ্চবাচ্য করল না। সুজাতা স্ট্যাম্প-প্যাডটা নিয়ে এল। সকলের টিপছাপ নিয়ে কাগজখানা পকেটস্থ করলেন বাসু! রমলা বললেন, খোকন, তোরা আবার বাইরে যা। ওঁর সঙ্গে আমার আরও কিছু কথা আছে।

দ্বিতীয়বার ঘর নির্জন হলে রমলা তাঁর চন্দনকাঠের বাক্স থেকে তিনখানি গিনি তুলে নিয়ে বাসু-সাহেবকে দিলেন। বললেন, দুটো আপনার 'ফি' আর একটা সুজাতাকে আমার উপহার। এবার আলমারিটা বন্ধ করে চাবিটা আমাকে দিয়ে যান।

তেরো

ফেরার পথে বাসু-সাহেব বললেন, চল শেয়ালদার কাছে 'সুইট হোম'-এ একটা ঢুঁ মেরে যাই।

—'সুইট হোম'! কেন?

—বিকাশবাবুর অ্যালেবাইটা পাকা কিনা যাচাই করতে। অর্থাৎ ছ তারিখে সন্ধ্যায় ও ঐ হোটেলে চেক-ইন করেছিল কি না।

কৌশিক বলে, কিছু মনে করবেন না মামু, আপনাব সন্দেহের লিস্টে কি বাণু-মামীমাও আছেন? তাঁর অ্যালেবাইটাও যাচাই করবেন?

সুজাতা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

বাসু বলেন, এইমাত্র জেনে এলাম যে, লোকটা ঘড়িয়ালস্য ঘড়িয়াল। 'ভাল'র জন্য যে এমন কৌশল করতে পারে, প্রয়োজনে 'খারাপে'র জন্যও

—কী জেনে এসেছেন?

বাসু গাড়ি চালাতে চালাতে বর্ণনা দিলেন—স্বর্গীয় চন্দ্রচূড়ের প্রেমপত্রখানির। বিকাশকে পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন—চিঠিখানির ইংরাজি বয়ান বিকাশের, অনুবাদ ডুপ্লে কলেজের এক অধ্যাপকের, যিনি ভাল ফ্রেঞ্চ জানেন। অনিতা সুযোগ মত আলমারি খুলে জেনে নিয়েছিল, চন্দ্রচূড় তাঁর ধর্মপত্নীকে প্রেমপত্রে কী জাতীয় মধুর সম্বোধন করতেন। চন্দ্রচূড়ের সইটা জাল করা হয়েছে। তারপর ঐ খামটা আর একটা বড় খামে ভরে বিকাশ তার দিল্লীবাসী এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দেয়, দিল্লীর ডাকঘরে 'পোস্টিত' হতে! আত্যন্ত পাকা ক্রিমিনালের কাজ! রমলা কিছুমাত্র সন্দেহ করেননি।

সুজাতা বলল, কিন্তু বিকাশবাবু স্বার্থটা কি? চন্দ্রচূড় খুন হন বা না হন—তিনি তো সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ।

—তা ঠিক। তবে এ পথ দিয়েই যখন যাচ্ছি তখন সুইটার হোমে পৌছনোর আগে সুইট-হোমটায় একটু ঢুঁ দিতে দোষ কি?

মনোহরবাবু অমায়িক লোক। হাত জোড় করে বললেন, ছরি ছার! আমার গোটা হোটেল অখন বুকট। একটা ঘরও খালি নাই।

বাসু-সাহেব আত্মপরিচয় দিলেন। তাতে মনোহর বিগলিত হলেন ঐ 'বার-অ্যাট-ল' অংশটায়। মনে হল না তিনি বাসু-সাহেবের নাম জীবনে কখনো শুনেছেন। বাসু বললেন, আমরা একটা 'ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন' করছি…

—কী করতাছেন? বাঙলায় কয়েন মোশাই। ইঙ্গিরি আমি ভাল বুঝি না—

—একজন অপরাধীকে খুঁজছি আর কি। আপনার হোটেল-রেজিস্টারটা যদি কাইণ্ডলি একবার দেখতে দেন?

মনোহরবাবুর মূর্তি অন্যরকম হল। বললেন, আজ্ঞে না। চোর-ছ্যাচড় বদমাইশ আমার হোটেলে ওঠে না। সবই ভদ্দরলোকের পোলা।

বাসু বললেন, অ। তা তিন কাপ চা হবে? বসে খেতাম?

—তিন কাপ ছাড্যা ছয় কাপ খান না—কিন্তু খাতা-পত্তর দ্যাখন চলব না।

—আর কাইণ্ডলি যদি একটা টেলিফোন করতে দেন—

—ক্যান দিমু না? আঠানা লাগব কিন্তু।

—শুায়র!—হিপ্-পকেট থেকে একটা আধুলি বার করেন বাসু-সাহেব।

মনোহর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ চোখ লাল। বললেন, আপনে আমারে গাইল দিলেন?

—গালি? ও আই সী। না না, শূয়োর কই নাই! SURE—যারে 'শিয়োর' কয় আর কি! আমার কিছুটা উরুশ্চারণের দোষ আছে।

মনোহর শান্ত হলেন। আধুলিটা পকেটস্থ করে ছোকরা চাকরটাকে বললেন, বাইরে তিনখাপ ছা।

কৌশিক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, কত নম্বর স্যার?

—45-7586, ওটা D.I.G./C.I.D.-র পার্সোনাল লাইন। সুকোমল যদি থাকে তবে আমার নাম করে বল সুইট-হোমের নামে একটা সার্চ-ওয়ারেণ্ট পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। আমরা এখানেই বসে চা খাচ্ছি।

অতি ধীরে গাত্রোত্থান করে মনোহর বলেন, ব্যাপারডা কি? D.I.G./C.I.D আবার কেডা?

—ডেপুটি আই জি. ডিটেক্‌টিভ্ ডিপার্টমেণ্ট। সার্চ-ওয়ারেণ্ট ছাড়া যখন খাতাপত্র দেখা যাবে না…

তিনটে ডিজিট ডায়াল করা হয়েছিল। বাকিটা কৌশিক করতে পারল না তার হাতটা মনোহরবাবু বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরায়।

একেবারে অন্তমূর্তি। সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।

হ্যাঁ…বিকাশবাবুকে উনি চেনেন…চন্দননগরের বিকাশ মুখুজ্জে।…ছয়ই নভেম্বর কইলেন না? হ্যাঁ, আইছিলেন। রাত্রে থাকছিলেন। খায়েন নাই। পরদিন তাঁর ফোন আইল…চন্দননগরে সেই চন্দ্রচূড়…নাম শুন্‌ছেন না? ঐ যে 'এবিছি' হত্যার কেস্! অরই তো বুনাই…সেই ফোন পাইয়াই ছুটল।… তখন কয়ডা? অ্যাই নয়ডা হইব মনে লাগে।

আরও অনেক তথ্য অযাচিতই বলে গেলেন। বিকাশ এসেছিল গাড়িতে। গাড়ি খারাপ হয়। সারাতে দেয়। প্রথমে মনোহরবাবু ওঁকে সীট দিতে রাজি হননি। কারণ দোতলার তিন-নম্বর ঘরে কলে কী গণ্ডগোল হয়েছিল। এ্যাক্কেরে পানি আসছিল না। আর সব সীট ভর্তি। তা বিকাশবাবু কইলেন, রাতটুকু তো থাকুম। পানি লয়্যা কী করুম? এক বাল্‌তি পানি বাথরুমে দিয়া ছ্যান, তাতেই হইব।

বাসু প্রশ্ন করেন, তা কলটা রাত্রে সারানো গেল না?

—না, রাতে পেলামবার পাইব কোই? পরদিন সারাইলাম।

কৌশিক বুঝে উঠ্‌তে পারে না এসব খেজুড়ে আলাপ করে কেন উনি সময় নষ্ট করছেন।

সুজাতা ইতিমধ্যে বর্ধমান থেকে ঘুরে এসেছে ময়ূরাক্ষীর গোপন বার্তা নিয়ে। এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র। সর্বসমেত সতের খানি। তার ভিতর সাতখানি অমল দত্তের। ছ-খানি যিনি লিখেছেন—বাঙ্‌লায়, তাঁর নাম ঠিকানা পরিচয় নেই। প্রতিটি পত্র শেষে 'ইতি তোমার মালাকর'। এঁর প্রথম পত্রটিতেই এই নামের গঙ্গোত্রী ইতিহাস আছে। প্রথম পত্রে প্রেমিক একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন: 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।' বাকি চারখানি ইংরাজিতে টাইপ করা।

ইনিও সাবধানী। ভাষা মার্জিত। পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। পত্রশেষে

লেখা আছে—'Yours Ever Mugdha-Bhramar' এই 'মুগ্ধ ভ্রমর'-টির ইংরাজিতে বেশ মুন্সিয়ানা আছে। টাইপিং-এও ভুল কম। বেশ বোঝা যায়, এ লোকটা বনানীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না—ওরা শুধু প্রেম করতে চেয়েছিল, অথবা ফুর্তি। ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের সম্ভাব্য বিড়ম্বনা এড়াতে আত্মগোপন করেছে।

কৌশিক বললে, আমার ধারণা—যে লোকটা বাসুমামুকে চিঠি লেখে সে প্রথম খুনটা করেছে এবং শেষ খুনটা। কারণ এ দুটির কোন মোটিভ নেই। খুন করে কেউ লাভবান হয়নি। খুনের জন্যই খুন। আর বনানীকে যে হত্যা করেছে সে ওর কোন প্রেমিক। লোকটা হয় স্যাডিস্ট, অথবা ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে…

সুজাতা বলে, কিন্তু 'নাম' আর 'স্থান'? নিতান্তই কাকতালীয়?

—হতে পারে। অথবা বনানীর হত্যাকারী ঐ অ্যাল্‌ফাবেটিক্যাল সুযোগটা নিয়েছে! যাতে পুলিস মনে করে, এটা ঐ অ্যাল্‌ফাবেটিক্যাল হত্যাবিলাসীর কাণ্ড! এমনটা কি হতে পারে না? বাসুমামু কী বলেন?

বাসু বলেন, এখনো সিদ্ধান্তে আসার মতো 'ডাটা' পাইনি।

রাণু বলেন, তুমি কি সেই বড়দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাও?

বাসু চটে ওঠেন, তা আমি কি করতে পারি? পুলিস পর্যন্ত এখন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। সেই বুড়ো ইস্কুল-মাস্টারটা ধরা পড়লেও হয়তো কিছুটা ধারণা করতে পারি। এখন তো ঘোর অন্ধকার। পণ্ডিচেরীর ফাইলটাও যে দেখতে পেলাম না! মহারাজজী একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে!

কৌশিক বলে, আপনি কি তাঁকে সন্দেহ করেন?

—করব না? মাস-মাস সাড়ে চারশ টাকা মণি-অর্ডার করত। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্ বা ক্রশ-চেকএ টাকা পাঠালে অনেক কম খরচ পড়ত। কিন্তু 'চেক' মানেই একটা 'ক্লু'—ব্যাঙ্ক রেফারেন্স। রহস্যটা পণ্ডিচেরীতে। কিন্তু পুলিস আমাকে সেসব কাগজ দেখতে দেবে না?

অবশেষে বুড়ো ইস্কুল-মাস্টারটা ধরা পড়ল।

চন্দননগরে। ষোল তারিখ সকালে।

বলাই বাজার করে ফিরছিল। হঠাৎ নজরে পড়ে একজন বুড়ো ভিখারী দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ে ওভারকোট নয়—

ছেঁড়া শার্ট। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা বেরিয়ে আছে। বলাই স্বপ্নেও ভাবেনি এই সেই লোক। খবরে কাগজে ছাপা ছবির সঙ্গে এই কঙ্কালসার ভিখারীর কোন সাদৃশ্যই নেই। বলাই বললে, এগিয়ে দেখ বাপু, এখানে ভিক্ষা হবে না। বাড়িতে অসুখ।

—না বাবা, ভিক্ষা চাইছি না।...মানে এটাই কি ডক্টর চন্দ্রচূড় চাটুজ্জের বাড়ি?

—হ্যাঁ, কাকে চাই? বিকাশবাবু?

—না বাবা, চাইছি না কাউকে। আচ্ছা ডক্টর চ্যাটার্জি যে বেঞ্চিটার সামনে খুন হয়েছিলেন তুমি সেটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা সম্ভাবনা বলাইয়ের মনে জাগল। একটা 'হিন্দি পিকচারে' ডিটেকটিভ বলেছিল—খুনী প্রায়ই খুনের জায়গাটা দেখতে আসে।

বলাই ওখান থেকে চিৎকার করে ওঠে—দারোয়ানজী!

দারোয়ান তার গুমটিতে বসে আটা মাখছিল। বলাইয়ের চিৎকার শুনে সে বেরিয়ে আসে।

অনিতা আর বিকাশ বাগানে গল্প করছিল। তারাও দৌড়ে আসে।

বৃদ্ধ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! বিকাশ দারোয়ানকে প্রশ্ন করে, পহছন্‌তেহ?

বৃদ্ধ সে কথা শুনে ডান হাতখানা বাড়িয়ে আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, না, না, আমি···আমি ওঁকে খুন করিনি!

দারোয়ান লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে শুধু বললে, কিতাববাবু!

বিকাশ প্রচণ্ড জোরে বৃদ্ধের চোয়ালে একটা ঘুষি মারল।

যে ভঙ্গিতে চন্দ্রচূড় উবুড হয়ে পড়েছিলেন ঠিক সে ভঙ্গিতেই হাত-পা ছড়িয়ে ছিটকে পড়লেন হেমাঙ্গিনী স্কুলের থার্ড-মাস্টার।

অনিতার কী হল—সে লাফ দিয়ে পড়ল বৃদ্ধের উপর। তাঁকে আক্রমণ করতে নয়, রক্ষা করতে। চিৎকার করে বলে, কেউ ওর গায়ে হাত দিও না! মরে গেলে কিন্তু তোমরাও খুনের দায়ে পড়বে!

বিকাশের তখনও রাগ পড়েনি। সে দারোয়ানের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নেয়। কিন্তু আঘাত করা সম্ভব হয় না। অনিতা বৃদ্ধকে আঁকড়ে উবুড় হয়ে পড়েছে। তখনও সে বলছে, বিকাশদা! ঠাণ্ডা হও! য়ু কাণ্ট টেক ল ইন য়োর ওন হ্যাণ্ডস্!

বিকাশ সম্বিৎ ফিরে পেল। তার ডান হাতটা ঝন্‌ঝন্ করছে। সে বাড়ির দিকে ফিরল থানায় ফোন করতে। অনিতা দেখল, বৃদ্ধ জ্ঞান হারিয়েছেন।

নিজের দাঁত দিয়ে জিবটা বোধহয় কেটে গেছে। মুখ দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। বললে, দারোয়ান জল, জল নিয়ে এস। বলাই দৌড়ে যা! ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্ শিগির!

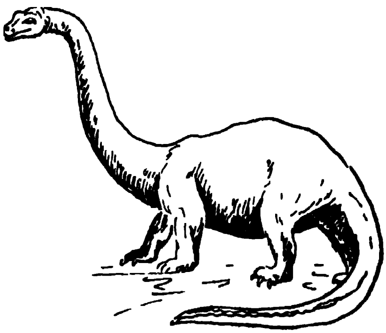

পরদিন সকালে চার-পাঁচখানি কাগজ নিযে নিউ আলিপুরের বাডিতে ওঁরা ভাগাভাগি করে পডছিলেন। সব কাগজেই প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটা বেরিয়েছে। অনেক ছবিও। সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে দুটি পত্রিকায়। বিশু এসে খবর দিল—একজন বাবু আব একটি মেয়েছেলে দেখা করতে চাইছেন। সুজাতা উঠে দেখতে গেল এবং ফিরে এসে বললে, ডক্টর দাশরথী দে আর তাঁর মেয়ে।

বাসু বললেন, এখানেই ডেকে নিয়ে এস।

ডাক্তাব দে বললেন, তিনি পুলিসে ফোন করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে জানানো হয়েছে এ অবস্থায় বাইবে কোনও লোকের সঙ্গে আসামীকে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

—উনি আছেন কোথায়? হাসপাতালে না হাজতে?

—হাজতে। ফার্স্ট-এড দিযে ওঁকে হাজতেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাসু বললেন, একটা টাকা দিন তো?

—আজ্ঞে?

—একটা ভাঙতি টাকা, কয়েন বা নোট।

এবারও প্রশ্নটা বোধগম্য হল না তাঁর। বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। মৌ তার ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে।

বাসু বলেন, টাকাটা তোমার বাবাকে দাও।· ইয়েস্! দ্যাটস্ কারেক্ট। এবার আপনি আমাকে ঐ টাকাটা দিন?·· হ্যাঁ আমাকেই।

সুজাতা অনেক আগে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। সে ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে রসিদ বইটা। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, রসিদটা কার নামে হবে?

—ডাক্তার দাশরথী দে, ফর অ্যাণ্ড অন বিহাফ অব্ শিবাজীপ্রতাপ বোস, লীগ্যালি ইনসেন্।

ডাক্তার দে বলেন, ওটা···মানে · ঐটুকুই আপনার রিটেইনার ?

—হ্যাঁ। আপনার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে হাজতের ভিতরে দেখা করার ছাড়পত্র। এখন আইনত আমি তাঁর লীগ্যাল কাউন্সেল। আপনাদের কিছুতেই হাজতে ঢুকতে দেবে না, কিন্তু আমাকেও কিছুতেই আটকাতে পারবে না।

চোদ্দ

হাজতের একান্তে একটি কোণায় বসেছিলেন বৃদ্ধ। কান-মাথা দিয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যেন কানকাটা ভিন্সেন্ট ভাঁ গখ্! বাসু-সাহেবকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে প্রহরী বাইরে গেল। শ্রুতিসীমার বাইরে, দৃষ্টিসীমার নয়। আসামী আগন্তুকের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে। পরক্ষণেই নত করে তার দৃষ্টি। তার মুখ ভাবলেশহীন।

—আপনি আমাকে চেনেন ?—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন বাসু।

কথা বলতে ওঁর বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল। মনে হয় জিবটা কেটে গেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে তবু বললেন, চিনি। উকিলবাবু।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার নামটা জানেন ?

শিবাজীপ্রতাপ নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করলেন। মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি।

—আমার নাম : পি. কে. বাসু।

—ও।

—আমার নাম ইতিপূর্বে কখনো শুনেছেন ?

আবার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো মাথাটা নড়ল। নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি।

—প্রসন্নকুমার বাসু, 'পি.কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল' এ নাম কখনো শোনেননি ?

এতক্ষণে উনি আগন্তুকের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করলেন, আপনি ছত্রপতি শিবাজীর নাম শুনেছেন ? চিতোরের রাণা প্রতাপের ?

—হ্যাঁ শুনেছি। নিশ্চয় শুনেছি।

—আপনি কি মনে করেন, আপনি ওঁদের মত একজন কেওকেটা ?

—না, তা মনে করি না! কিন্তু তাহলে আপনি কেমন করে জানলেন যে, আমি উকিল!

—সহজেই। আমার মতো কপর্দকহীন আসামীর জন্য আদালত থেকে সরকারী খরচে উকিল দেওয়া হয় এটা জানি বলে।

—না। ওখানে ভুল হচ্ছে আপনার। আমি সরকার-নিযুক্ত নই। আমাকে নিযুক্ত করেছেন ডক্টর দাশরথী দে। তাঁকে চেনেন?

হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেন বৃদ্ধ, বাঃ! দাশুকে চিনব না? কেমন আছে ওরা? দাশু, বৌমা, মৌ?

—ওরা সবাই ভাল আছে। শুনুন, আমি আপনার পক্ষের উকিল, মানে আপনার বিরুদ্ধে পুলিস যে অভিযোগ এনেছে আমি হচ্ছি তার··

—বুঝেছি, বুঝেছি! য়ু আর দ্য ডিফেন্স-কাউন্সেল!

—আমাকে সব কথা খুলে বলবেন তো? সব, স—ব কথা?

বৃদ্ধ উর্ধ্বমুখে অনেকক্ষণ কী-যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, বলব, তবে এক শর্তে!

—শর্ত। কী শর্ত?

—আপনি কথা দিন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন যেন আমার···আমার ফাঁসি হয়। যাবজ্জীবন নয়! কথা দিন!

বাসু একটু থমকে গেলেন। বৃদ্ধের কথাবার্তা, ব্যবহারে পাগলামির কোনও লক্ষণ তো নেই!

বলেন, কেন? কেন নয় বেকসুর খালাস?

—সেটা অসম্ভব! আর তাছাড়া তাহলে তো আবার সেই রেকারিং ডেসিমেল!

—তার মানে?

—নিজেকে খুঁজে ফেরা। কিছুতেই নিজের নাগাল পাব না···'খুড়োর কল'-এর মতো ·

—অথবা সেই চিল্লানোসরাস্-এর মতো

—এক্‌জ্যাক্টলি! যে কোনদিনই ব্যাচারাথেরিয়ামের নাগাল পাবে না।

—তাহলে ছবিটা কেটে ফেললেন কেন?

—কেটে তো ফেলিনি। ছুরি মেরে ছিলাম!···ও ইয়েস্! অ্যাদ্দিনে ঠিক মনে পড়েছে। এই দেখুন দাগ!

ডান হাতের তালুটা মেলে ধরেন। সত্যিই তাতে একটা কাটা দাগ। বেশি পুরানো নয়।

বাসু প্রশ্ন করেন, কাকে ছুরি মেরেছিলেন? চিল্লানোসরাস্‌কে?

—দূর! তাকে মারব কেন? সে তো কামড়ায় না। শুধুমুধু হাঁ করে! ভয় দেখায়।

—তবে কাকে ছুরি দিয়ে মেরেছিলেন?

—ভুলে গেছি।

বাসু কোন নাগলিই পাচ্ছেন না। সবই ধোঁয়াশা। আবার প্রশ্ন করেন, আপনার ঘরে একটা টাইপ-রাইটার দেখলাম। সেটা কত দিয়ে, কোন দোকান থেকে কিনেছিলেন মনে আছে?

—কিনিনি তো। আমার এক ছাত্তর উপহার দিয়েছিল। তার নামটা ভুলে গেছি।

—নাম তো ভুলে গেছেন, চেহারাটা মনে আছে?

—ধুস্! কদ্দিন তাকে দেখি না।

—নাম তো মনে নেই, উপাধিটা মনে আছে। বামুন না কায়েত, হিন্দু না মুসলমান…

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বলাতে মনে পড়ল, ছেলেটি মুসলমান। আর কিছু মনে নেই।

বাসু এবার অন্যদিক থেকে প্রশ্নবাণ নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। বলেন, এই নামগুলোর একজনকেও চেনেন? অনাদি, বনানী…

—বাঃ! ওদের খুন করলাম, আর নাম জানব না? আসানসোলের অধর আঢ্যি, উনিশে অক্টোবর, বর্ধমানের বনানী বনার্জী, সাতাশে অক্টোবর, নেক্সট চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চাটুজ্জে, সাতই নভেম্বর।

—আর পঁচিশে ডিসেম্বর?

—পঁচিশে ডিসেম্বর! সেটা তো লর্ড যীসাস্-এর জন্মদিন! সেদিন আবার কাউকে খুন করতে যেতে হবে নাকি? আঃ—ছি-ছি-ছি! অমন পুণ্যদিনে! কই কোন নির্দেশ তো পাইনি?

বাসু হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, যাঃ! এটা কি ভোলা যায়? ঐ একই লোক তো ইন্‌স্ট্রাকশান দিল?

—কোন লোক?

—সেটা তো আপনি বলবেন! কোন্ লোক?

বৃদ্ধ আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মনে হল। অথবা অপরূপ অভিনয়! মনে হল, তিনি অন্ধকারের ভিতর হাৎড়াচ্ছেন—কে সেই লোকটা, যে বারে বারে ওঁকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে, আসানসোলের অনাদি আঢ্যি, বর্ধমানের বনানী বনার্জি, চন্দননগরের চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি—

শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আয়াম সরি। একদম মনে পড়ছে না।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। আমি আবার আসব। মনে করবার চেষ্টা করুন। কে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল: 'এ' ফর আসানসোল, 'বি' ফর বার্ডওয়ান; 'সি' ফর চন্দননগর, অ্যাণ্ড 'ডি' ফর…

—কী? 'ডি' ফর কী?

—ভাবুন ভাবুন। 'ডি' ফর কী হতে পারে? ক্লু তো দিয়ে গেলাম। একই লোক নির্দেশ দিল। পঁচিশে ডিসেম্বর! এই নিন, এই নোট বই আর পেনসিলটা রাখুন। যখন যেটা মনে পড়বে চট্ করে লিখে ফেলবেন, 'ডি' ফর কী? কে আপনাকে টাইপ-রাইটারটা উপহার দিয়েছিল, কে আপনাকে এতগুলো নির্দেশ একের পর একটা দিয়ে যাচ্ছিল·· কেমন?

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে।

বৃদ্ধও উঠে দাঁড়ালেন। বাসু-সাহেবের হাত দুটো ধরে বললেন, আমি আমার কথা রেখেছি। আপনিও আমার অনুরোধটা রাখবেন তো?

—কোনটা?

—যাতে ওরা যাবজ্জীবন না দেয়! তিন তিনটে খুন! ফাঁসি না দেবার কোন যুক্তি নেই। নয়?

বাসু-সাহেব ফিরে আসতেই কৌশিক এগিয়ে এল। প্রশ্ন করল, শিবাজী-বাবুর সঙ্গে দেখা হল?

—হল! কিন্তু কিছুই ওঁর মনে পড়ছে না। তুমি ইতিমধ্যে কতদূর কী করলে বল?

কৌশিক তার রিপোর্ট দাখিল করল। খবরের কাগজে যে মেণ্টাল হস্-পিটালের উল্লেখ আছে সেখানে সে গিয়েছিল। মানসিক চিকিৎসালয়টি ভাল। ডাক্তারবাবুও বেশ সজ্জন। শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর কেস্-হিস্ট্রিটা তিনি রেজিস্ট্রি খুলে দেখিয়েছিলেন। কৌশিক সেটা আদ্যন্ত টুকে এনেছে। মাস্টার-মশাই কবে ঐ মানসিক হাসপাতালে প্রথম আসেন, কতদিন ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা রোগীর অবচেতন মনের জট ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে যেসব প্রশ্নোত্তর করা হয়েছে তাও। তাতে ওঁর পূর্বকথা অনেক কিছু জানা গেল। বাসু-সাহেব অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন: এই তো! নামটা পাওয়া গেছে। হানিফ মহম্মদ!

কৌশিক তৎক্ষণাৎ বলে, হ্যাঁ। পরীক্ষার হলে উনি যার গলা টিপে ধরেন তার নাম হানিফ মহম্মদ। এটাই প্রথম কেস। তারপর··

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, হানিফ মহম্মদ! আশ্চর্য! তাহলে আমি যে পথে

আবার চুপ করে যান উনি। বাসু-সাহেব কোন পথে কী ভাবছেন তা কৌশিকের জানা নেই কিন্তু এটুকু জানে যে, এখন নীরবতা ভঙ্গ করতে নেই।

বাসু হঠাৎ তুলে নিলেন টেলিফোনের রিসিভারটা। একটা নম্বর ডায়াল করলেন।

—হ্যালো, আমি পি. কে. বাসু বলছি, তোমার বাবা কি বাড়ি আছেন ?··· ও নেই বুঝি···হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। উনি ভালো আছেন, শারীরিক ও মানসিক। তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন হ্যাঁ আমাকে তাঁর ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসেবে মেনে নিয়েছেন। আচ্ছা শোন, একটা কথা বলতে পার ? ওঁর ডান হাতের তালুতে একটা কাটা দাগ দেখলাম—হাতটা কী ভাবে · ইয়েস, বল ?

কৌশিক নীরবে অপেক্ষা করে। বুঝতে পারে ও প্রান্ত থেকে মৌ একটি দীর্ঘ ইতিহাস বলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ একটানা শুনে বাসু-সাহেব বললেন, তা সেদিন এসব বলনি কেন ? আই সী! ঠিক কথা! সেদিন আমি ওঁর ডিফেন্স-কাউন্সেল ছিলাম না। তা সেদিন আর কিছু গোপন করেছিলে নাকি ?···বাঈ জোভ্! ডায়েরী! ওঁর নিজে হাতে লেখা! সেটা পুলিশে সীজ করেনি ? ও! তুমি আগেই লুকিয়ে ফেলেছিলে! শোন, কৌশিক, রিপ্রেজেন্টিং 'সুকৌশলী' আধঘণ্টার মধ্যে তোমার কাছে যাচ্ছে। তার আইডেন্টিটি চেক আপ্ করবে প্রথমে, তারপর আমার ভিজিটিং কার্ডের পিছনে তোমাকে লেখা একখানা চিঠি পেলে কৌশিকের হাতে ডায়েরিটা দিয়ে দিও। কেমন ? · কী ? বাঃ! আমার লাইন কেউ ট্যাপ করছে কি না তার গ্যারান্টি কী ? ঐ ডায়েরিটা ভাইটাল এভিডেন্স!

নিজের ভিজিটিং কার্ডের পিছনে মৌকে লিখিত নির্দেশ দিয়ে কার্ডখানা কৌশিকের হাতে দিয়ে বললেন, কী করতে হবে বুঝতে পেরেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়িটা নিয়ে ডক্টর দাশরথী···

—আজ্ঞে না! ট্যাক্সি নিয়ে যাও। গাড়ি নিয়ে আমি ঐ মেন্টাল হস্‌পিট্যালে যাব।

—কেন মামু ?

—যে ভাইটাল ক্লু-টা তুমি জেনে আসনি, সেটা জানতে! অফ্ য়ু গো!

দুজনে দুদিকে রওনা হয়ে গেলেন আবার।

বাসু-সাহেব যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখটা থম্‌থম্ করছে। ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সুজাতার সঙ্গে। বাসু প্রশ্ন করেন, কৌশিক ফিরেছে ?

—হ্যাঁ! ডায়েরিটা আপনার স্টাডিরুমের টেবিলে···

—থ্যাঙ্কস্! শোন! আমাকে কেউ যেন এখন ডিসটার্ব না করে! ও. কে. ?

উনি সটান ঢুকে গেলেন ওঁর চেম্বারে।

ঘণ্টাখানেক পরে ইন্টারকমে উনি রাণীদেবীকে খুঁজলেন, রাণু, উড্ য়ু কাইণ্ডলি হেল্প্ মি এ বিট ? এ ঘরে চলে এস প্লীজ।

হুইল-চেয়ারে পাক মেরে রাণু প্রবেশ করলেন ওঁর খাশ-কামরায়।

বাসু বলেন, ডায়েরিটা পড়া হয়ে গেছে। এখন আমার দুটো কাজ। এক নম্বর একটু নিরিবিলি চিন্তা করা, দুনম্বর—একগাদা টেলিফোন করা। তুমি দ্বিতীয় কাজের দায়িত্বটা নাও। একে একে ডায়াল করে লোকগুলোকে ধর। লাইন পেলেই আমাকে দিও। একটা কাগজে নামগুলো লিখে নাও। এই পর্যায়ে : রবি বোসকে তার অফিস নম্বারে, চন্দননগরের বিকাশকে, 'কুশীলব'-এর দপ্তরে আর স্যারকে।

রাণীদেবী খুশি হলেন কিছু করতে পেয়ে। টেলিফোন গাইড আর নোটবই দেখে একে একে নম্বরগুলো ডায়াল করতে থাকেন। 'স্যার' বলতে কার কথা বলতে চেয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি বাণুর, অশীতিপর ব্যারিস্টার এ. কে. রে, যাঁর অধীনে প্রথম জীবনে জুনিয়ার হিসাবে বাসু-সাহেব ব্যারিস্টারি শুরু করেছিলেন।

প্রথমেই রবি বসু। লাইনটা পেতেই রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন রাণুদেবী।

—শোন রবি। আমি বাসু বলছি। আমি স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছেছি A. B. C.-র-মধ্যে একটা অ্যাল্‌ফাবেটের জন্য S. P. C. দায়ী নন! সরি, টেলিফোনে আর কিছু বলা যাবে না। তুমি কখন আসতে পারবে?…না, না, অত তাড়াতাড়ি নয়। কারণ এখানে আসার আগে তোমাকে আর একটি কাজ করে আসতে হবে! তোমার সন্ধানে কোন 'এ-ওয়ান-গ্রেড'-এর পকেটমার আছে?…হ্যাঁ গো! 'পকেটমার'! কী আশ্চর্য! পুলিসের লোক আর 'পিকপকেট' চেন না?…হ্যাঁ! এক সন্ধ্যার জন্য তাকে নিযুক্ত করতে চাই!… যাকে পাও · মকবুল, ছোট খোকন, যোসেফ যাকে হয় তবে পাকা হাত হওয়া চাই!…ও.কে। আমি অপেক্ষা করব।…হ্যাঁ, ঐ 'কনৌশার অফ্‌ পিক-পকেট'কে সঙ্গে নিয়ে আসা চাই।

রিসিভারটা ফেরত দিয়ে উনি পাইপ ধরালেন। রাণী দেবী জানতে চাইলেন না পকেটমারের কী প্রয়োজন হল। চন্দননগরে ডায়াল করতে থাকেন।

বিকাশ জানালো, তার মনে আছে। রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা। হ্যাঁ, অনিতাকে নিয়েই সে আসবে। তার দিদি একটু ভাল আছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে। বোধকরি, স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের অপেক্ষায় তিনি এভাবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন। হ্যাঁ, উনি স্বামীকে চিঠি লিখেছেন। ইংরাজিতে। ডিক্‌টেশন দিয়েছেন। শুক্লা লিখে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, সে চিঠি ডাকে দেওয়া হয়নি। বিকাশ আরও বলল, এখন কি আর রবিবারের মিটিংটার আদৌ কোন মানে হয়?

বাসু-সাহেব জবাবে বললেন, আসানসোল থেকে সুনীল, বর্ধমান থেকে অমল দত্ত, মনীশ সেনরায় আর ময়ূরাক্ষী আসছে। ওদের দুজনকে মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের দুটি ফটো আনতে বলা হয়েছে। বিকাশও যেন চন্দ্রচূড়ের একটি আলোকচিত্র নিয়ে আসে। ঘরোয়া পরিবেশে পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা জানানো আর স্বর্গতঃ আত্মার শান্তিকামনা। অপরাধী যখন ধৃত তখন আর তো কিছু করার নেই!

'কুশীলব'-এর দপ্তরেও একই বার্তা জানানো হল। আরও অনুরোধ করা হল, রবিবারের এই যৌথ শোকসভায় 'কুশীলব'-এর তরফে কেউ যেন বনানীর অভিনয়-প্রতিভার বিষয়ে কিছু বলেন, আর উষা বাগচী যেন অবশ্যই আসে। দুটি গান গাইতে। উদ্বোধনী আর সমাপ্তি সঙ্গীত। বাসু-সাহেব জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন ঊষার বাড়িতে টেলিফোন আছে। অতঃপর তাকে ব্যক্তিগত-ভাবে বাড়িতে ফোন করে অনুরোধ করলেন। জানতে চাইলেন, তোমাকে এ জন্য যে সম্মানদক্ষিণা ·

উষা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে, কী বলছেন স্যার! বনানী আমার বন্ধু, সহকর্মী! তার স্মরণসভায় আমি পয়সা নিয়ে গান গাইব? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আসব, স-তবল্‌চি।

রাণী জিজ্ঞাসা করেন, তোমার লিস্ট খতম। আর কাউকে ফোন করতে হবে কি?

—হ্যাঁ, ডক্টর মিত্র, ডক্টর ব্যানার্জি আর টেম্পল চেম্বারে নিবিকে।

—'নিবি' কে?

—ভাল নামটা মনে নেই, 'মজুমদার নিবি'-তে এন্ট্রি আছে আমার 'ফোন-বুকে।'

ক্রিমিনোলজি এক্সপার্ট ও মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতটিকে একই আমন্ত্রণ জানানো হল।

নিবি মজুমদার ব্যক্তিটিকে রাণী চিনতে পারলেন না। কিন্তু বাসু-সাহেবের একতরফা আলাপচারী শুনে ওঁর মনে হল তিনি কোনও প্রখ্যাত সলিসিটার ফার্ম-এর পার্টনার।

—কে নিবি? হ্যাঁ, আমি বাসুই বলছি। আমার মনে হয় সময় হয়েছে। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি দলিলটা নিয়ে রবিবার বিশ তারিখ সন্ধ্যা ছটার সময় আমার বাড়িতে চলে এস। ···হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তুমি উত্তরপ্রান্তে থাক। বাড়ি ফিরতে রাত হবে। তা হোক না একদিন। গিন্নিকে বলে এস যে, আমার বাড়িতে আসছ! না হয় বল আমিই আরতিকে ফোন করে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি তার কর্তাকে আটকে রাখার জন্য!

ও প্রান্তবাসী কী বললেন তা শুনতে পেলেন না রাণী। তবে হাসির কথা নিশ্চয়ই। কারণ হেসে উঠলেন বাসু-সাহেব। বললেন, সেম টু য়ু!

রাণী দেবীর ডিডাক্‌শান—ঐ অজ্ঞাত নিবি মজুমদারের শেষ শব্দটা ছিল 'গুড্‌ল্যাক স্যর!'

বাসু-সাহেব হেসেছেন। 'পর্বতো খোশমেজাজ হাস্যাৎ।' তাই রাণী এতক্ষণে সাহস করে বললেন, তিনটে খুনের অন্তত একটা মাস্টারমশাই করে।নি, নয়?

বাসু পাইপে একটা টান দিয়ে বললেন, কারেক্ট! আর কোন ডিডাক্‌শান?

—এবং সেই খুনের নায়ক রবিবার সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত হলেন? ঠিক বলেছি?

—সুপার্ব! এ না হলে পি. কে. বাসুর বউ!

—এবং সেই একমাত্র খুনটা হচ্ছে: বনানী?

—পার্টলি কারেক্ট!

—'পার্টলি কারেক্ট' মানে? হয় 'কারেক্ট' নয় 'ইন্‌কারেক্ট'। তিনটে খুনের একটা…

—এ ধাঁধার সমস্যা পি. কে. বাসুর বউয়ের স্বামী ছাড়া কেউ সমাধান করতে পারবে না!

ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। রাণীদেবী তুললেন, শুনে নিয়ে যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, লডন স্ট্রীট থেকে আই. জি. ক্রাইম তোমাকে খুঁজছেন।

বাসু রিসিভারটা গ্রহণ করে তার 'কথা-মুখে' বলেন, শুভ সন্ধ্যা ঘোষাল সাহেব! বলুন?

—আজ সন্ধ্যায় আপনার প্রোগ্রাম কী?

—নিত্যকর্মপদ্ধতি-অনুসারে গৃহাবরোধে মদ্যপান।

—একটু পরিবর্তন করা যায় না? না, না, প্রোগ্রামটা বদলাতে বলছি না, 'ভেনু'টা—অর্থাৎ নিত্যকর্মপদ্ধতিটা যদি আমার গৃহাবরোধে সারতে আসেন? অ্যারাউণ্ড সাড়ে আটটায়?

—ম্যাগনিফিক্! কিন্তু হেতুটা?

—কাল হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, আমার 'সেলারে' একটা 'রয়্যাল-স্যালুট' বন্দিনী অবস্থায় প্রতীক্ষারতা। ও বস্তুটা একা একা উপভোগ করা যায় না, আবার উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়াও শক্ত। আপনি কি আমাকে সঙ্গ দিয়ে কৃতার্থ করতে পারেন না?

—আসাতে! আমি রাজী। কিন্তু একটি শর্ত আছে ঘোষাল-সাহেব!

—হুকুম করুন।

—'রয়্যাল-স্যালুট'-এর সঙ্গে আপনি প্যারীচরণ সরকারকে পাঞ্চ করবেন না' এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—প্যারীচরণ সরকার? অস্যার্থ?

—প্যারীচরণ ছিলেন 'The Arnold of the East!' তাঁর করুণাতেই প্রথম A.B.C.D শিখেছিলাম।

টেলিফোন রিসিভারে ভেসে এল ঘোষাল-সাহেবের অট্টহাসি। বললেন, কিন্তু 'প্যারীচরণ'কে 'রয়্যাল স্যালুট'-এর সঙ্গে কেন পাঞ্চ করা যাবে না, তার কারণ তো একটা দেখাবেন?

—স্যাওর! প্যারীচরণ সরকার শুধু 'ফাস্টবুক' লিখেই ক্ষান্ত হননি—তিনি আরও একটি পাপ কাজ করেছিলেন। তিনি 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণ সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

আবার অট্টহাস্য। ঘোষাল বললেন, চটজল্‌দি জবাব সব সময়ে আপনার ঠোঁটের আগায়। অলরাইট! আমরা বরং 'এ. বি. সি. ডি.'র বদলে 'অ-আ-ক-খ' পাঠ করব। ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়। বিদ্যাসাগর মশাইও জীবনে অনেক পাপ কাজ করেছেন, কিন্তু মদ্যপদের সহ্য করতেন—না হলে মাইকেল তাঁর Vid-এর করুণালাভ করতেন না।

রাত পৌনে নটা। ঘোষাল-সাহেবের ড্রইংরুম। স্তিমিত আলোক। টিপয়ের উপর সদ্য-বন্ধনমুক্ত রয়্যাল স্যালুটের বোতল, দুটি গ্লাস, বরফের কিউব, স্ন্যাক্‌স্—আর দু-প্রান্তে দুই প্রৌঢ়।

আই. জি. ক্রাইম বললেন, আপনি হয় তো বরাটের উপর রাগ করেছেন বাসু-সাহেব, কিন্তু

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা ঘোষাল-সাহেব! বরাটের উপর আদৌ আমি রাগ করিনি। সে আমাকে 'ফেয়ার অফার' দিয়েছিল। আমি যদি ঐ পাগলটার ডিফেন্স দেব না বলে প্রতিশ্রুতি দিই তাহলেই সে পুলিসের 'সীজ' করা জিনিসগুলো আমাকে দেখতে দেবে। ন্যায্যকথা। পুলিস এখন চার্জ-ফ্রেম করতে ব্যস্ত। প্রতিবাদীপক্ষকে বরাট তার হাতের তাস আগে-ভাগেই দেখিয়ে দিতে পারে না। অধিকার-বহির্ভূত সে কিছু করেনি।

—তার মানে আপনি শিবাজীপ্রতাপের ডিফেন্স দিতে মনস্থ করেছেন?

—ইয়েস! আমি ইতিমধ্যেই তার কেসটা নিয়েছি। হাজতে তার সঙ্গে দেখাও করে এসেছি।

—আপনার কি ধারণা লোকটা সত্যিই পাগল? সে স্বজ্ঞানে খুনগুলো করেনি? ওর পিছনে আর কোনও ক্রিমিনাল লুকিয়ে রয়েছে?

বাসু স্মিত হাসলেন। জবাব দিলেন না।

—অলরাইট! অলরাইট! আই অ্যাডমিট! আপনিও আপনার হাতের তাস আগে-ভাগে দেখাতে পারেন না। ঠিক আছে। আমিই খুলে বলি। বুঝতেই পাচ্ছেন, একটা বিশেষ বার্তা আপনাকে জানাতে চাই বলেই এই নিভৃত সাক্ষাতের আয়োজন। আমি মন খুলে আমার বক্তব্য রাখি। আপনি আপনার হাত এক্সপোজ না করে যতটুকু সম্ভব আপনার মতামত জানান। প্রথম কথা: আমার বিশ্বাস—তিনটে খুনই শিবাজীপ্রতাপ করেনি। লোকটার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো নিশ্ছিদ্র—ওর টাইপ-রাইটার, ওর আলমারিতে সাজানো ধর্মপুস্তক এবং সবার উপরে না-খোলা প্যাকেটে ঐ সুকুমার রায়-এর বইটা, যা থেকে তিন-তিনটে ছবি কেটে তিনটি চিঠিতে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছিল। ডক্টর মিত্র অজ্ঞাত হত্যাবিলাসীর বিষয়ে যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সবগুলোই মিলে গেছে। এক নম্বর, লোকটা অঙ্কের মাস্টার, দু নম্বর সে শিশুসাহিত্য পড়তে ভালবাসে, তিন নম্বর, ভাল টাইপিং জানে, চার নম্বর সে 'মেগ্যালোম্যানিয়াক'; পাঁচ নম্বর সে হত্যাবিলাসী। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, ঐ লোকটা দ্বিতীয় খুনের জন্য দায়ী। আই মীন, বনানী ব্যানার্জি। মনীশ সেনরায় যাকে ঐ ফার্স্টক্লাস কামরায় আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখেছিল সে লোকটা ঐ ষাট বছরের আধা-পাগলা বুড়ো হতে পারে না। শুধু এই কারণেই শিবাজীপ্রতাপের বিরুদ্ধে চার্জটা ফ্রেম করা যাচ্ছে না। বরাটও এটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। খুব সম্ভবত পুলিস শিবাজীপ্রতাপের বিরুদ্ধে দুটো খুনের চার্জই আনবে। বনানী-মার্ডার নিয়ে আমরা এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

ঘোষাল-সাহেব থামলেন। বাসু নিঃশব্দে এক চুমুক পান করে নিরুত্তরই রইলেন।

আই. জি. ক্রাইম আবার শুরু করেন, আপনি কি বনানী হত্যার বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত? যেহেতু আপনার ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে ও চার্জটা নেই?

বাসু বললেন, আমি গোটা কেসটাকে এ-ভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখতে প্রস্তুত নই। আমার মতে তিনটি হত্যা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। তাদের পৃথক করা সম্ভবপর নয়।

—কেন নয়? ধরা যাক, দ্বিতীয়টা অন্য লোকের হাতের কাজ। সে নাম-

উপাধির সুযোগ নিয়ে বর্ধমানের কেসটাকে অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজের একটা সেকেণ্ড টার্ম হিসাবে চালিয়ে দিতে চাইল ?

—কিন্তু বনানী যখন খুন হয় তখনো তো আমরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিইনি ? বনানীর হত্যাকারী তো জানে না যে, আমরা ঐ জাতের চিঠি পাচ্ছি ?

—ধরুন কোন সূত্রে সে তা জেনেছে। আমরা সাত-আটজনে বসে কনফারেন্স করেছি। ঘরে স্টেনো ছিল। এঁরা সকলেই অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন, কিন্তু বাড়ি ফিরে এমন মুখরোচক গল্পটা নিজ-নিজ ধর্মপত্নীকে যে গল্প করে শোনাননি তার গ্যারান্টি নেই। আর মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না এটা তো প্রবাদবাক্য !

বাসু বলেন, তা সত্ত্বেও আমি যা বলেছি সে অসুবিধেটা থেকেই যাচ্ছে। তিনটি কেসকে পৃথক করা যাচ্ছে না। একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন আমি জেনেছি, এ টাইপ-রাইটারটা শিবাজীবাবুকে যে উপহার দিয়েছিল তার নাম হানিফ মহম্মদ। কিন্তু লোকটা কে, কোথায় আছে তা জানি না। আমি জেনেছি, পণ্ডিচেরীর এক অজ্ঞাত মহারাজ শিবাজীবাবুকে মাস মাস টাকা পাঠাতেন এবং পার্সেলে বই পাঠাতেন ; অথচ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আমি কোনও-অনুসন্ধান করতে পারিনি। আমি জানি না, এগুলো আপনারা জানেন কিনা, পুলিস কোনও তদন্ত করেছে কিনা। করে থাকলেও পুলিস তা আমাকে জানাতে পারে না ; কারণ আমি শিবাজীবাবুর ডিফেন্স-কাউন্সেল। এক্ষেত্রে আমি কেমন করে…

বাধা দিয়ে ঘোষাল-সাহেব বলেন, জাস্ট এ মিনিট। আমি জবাব দিচ্ছি। পুলিস এ সব তদন্ত শেষ করেছে। তার ফলাফল আমিই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। শুনুন মিস্টার বাসু। লোকটা যদি সত্যই নিরাপরাধ হয় তাহলে তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেবার ইচ্ছা আমাদের কারও নেই।… হ্যাঁ, ওকে যে লোকটা টাইপ-রাইটার উপহার দিয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে তার নাম হানিফ মহম্মদ। হেমাঙ্গিনী বয়েজ স্কুলে তার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস পুলিসে জোগাড় করেছে। লোকটা মারা গেছে। বছর দশেক আগে। আপনি তো জানেনই যে, প্রতিটি ঘড়ির পিছনে যেমন ম্যানুফ্যাকচারার-এর দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা থাকে, তেমনি প্রতিটি টাইপ-রাইটার যন্ত্রেরও তাই থাকে। সেই সূত্র থেকে আমরা একথাও জেনেছি যে, ঐ যন্ত্রটা রেমিংটন্ কোম্পানীর ডালহৌসি-স্কোয়ার কাউন্টার থেকে দেড় বছর আগে বিক্রয় হয়—হানিফের মৃত্যুর বহু পরে। যে লোকটা কিনেছিল সে নগদ মূল্যে খরিদ করেছিল। ক্রেতার হদিস পাওয়া যায়নি। ফলে শিবাজীপ্রতাপের ও কথাটা ভুল—উপহারটা হানিফ পাঠায়নি।… তিন-নম্বর : পণ্ডিচেরীতে তল্লাসী চালিয়ে একথাও জানা গেছে যে, 'মাতৃসদন'

এবং তার 'মহারাজ' সবই অলীক। সুতরাং একটি সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে নেওয়া চলে ' 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক্'টাকে দিয়ে একের পর একটি খুন করালেও সমস্ত পরিকল্পনার পিছনে আর একটি ব্রেন কাজ করে চলেছে। কে, কেন, কী-ভাবে তা আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। এবার বলুন বাসু-সাহেব ? আপনি কি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ?

বাসু বলেন, আপনার ও কথার জবাব দেবার আগে আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে। পুলিসের মতে এক নম্বর: শিবাজীপ্রতাপ প্রথম ও তৃতীয় খুনটা স্বহস্তে করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় খুনটা করেননি। দু-নম্বর: সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে একটি অজ্ঞাত অতি-ধূর্ত পাকা ক্রিমিনালের হাত আছে—যে লোকটা শিবাজীপ্রতাপকে (i) টাইপ-রাইটারটা উপহার দিয়েছে (ii) মাস-মাস মাহিনা দিয়েছে (iii) তাঁব 'হোমিসাইডাল' মনোবৃত্তিকে উস্‌কিয়ে এক ও তিন নম্বর খুন দুটি করিয়েছে। এবং তিন নম্বর: সেই পাকা-ক্রিমিনালটির পাত্তা আপনারা পাচ্ছেন না। কেমন তো? এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন: সেই পাকা ক্রিমিনালের মূল উদ্দেশ্যটা কী ? কোনটা তার টার্গেট ? কী কারণে দেড বছর ধরে সে এই বিরাট পরিকল্পনা ফেঁদে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে ?

— এর একটাই জবাব হতে পারে, বাসু-সাহেব! সেই অজ্ঞাত লোকটাই আসলে হচ্ছে 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক!' মানুষ খুন করাতেই তার তৃপ্তি। এবং সেই পাকা ক্রিমিনালটি কোন কারণে আপনাকে শত্রুপক্ষ মনে করে। হয়তো আপনার হাতে তার কোনও হেনস্থা হয়েছে, তাই আকাশচুম্বী আত্মম্ভরিতা নিয়ে আপনাকে ডি-ফেম করে কুখ্যাত হতে চাইছে। শিবাজী-প্রতাপকে সে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করেছে শুধু। নিজে হাতে সে একটি মাত্র খুন করেছে—ঐ দু'নম্বর হত্যাটা: বনানী ব্যানার্জি। বাকি দুটি শিবাজীকে প্ররোচিত করে তার হত্যাবিলাস চরিতার্থ করেছে। এই আমার থিয়োরি। আপনি কী বলেন ?

বাসু-সাহেব আর এক চুমুক পান করে বললেন, মিস্টার ঘোষাল! আপনি আপনার সবকটি হাতের তাস টেবিলে বিছিয়ে দিয়েছেন। আয়াম এক্সট্রিমলি সরি—আমি এখন, এই মুহূর্তেই আমার সবগুলো তাস মেলে ধরতে পারছি না। কিন্তু অধিকাংশ তাসই আমি বিছিয়ে ধরছি। দেখুন, তাতে যদি কোনও সুরাহা হয়। প্রথম কথা: সমস্ত ব্যাপারটা বর্তমানে আমার কাছে স্ফটিক স্বচ্ছ—কোথাও কোনও আবিলতা নেই!

—মানে ?

—মানে, আপনার বর্ণনা অনুযায়ী নেপথ্যচারী হত্যাবিলাসীর পরিচয় আমি জানি।

—জানেন! আপনি জানেন লোকটা কে?

—জানি। তাকে আপনিও চেনেন। আপনারা অনেকেই চেনেন। সে আমাদের অতি নিকটেই রয়েছে। লোকটা আদৌ 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক' নয়। তা সত্ত্বেও সে যে কেন পরপর তিনটি খুনের পরিকল্পনা করেছে তাও আমার জানা—

ঘোষাল-সাহেব উৎসাহে বাসুর হাতটা চেপে ধরে বলেন, আপনি জানেন? কে? কেন?

—জানি। কে এবং কেন।

—তাহলে কেন আমাদের বলতে পারছেন না?

—একটিমাত্র কারণে। আপনাকে যদি এখনই নামটা বলে দিই, তাহলে কোনদিন তার 'কনভিকৃশন' হবে না!

—কেন? কেন?

—কারণ যে-যে ক্লুর সাহায্যে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অপরাধীকে চিহ্নিত করেছি তা জানালে আপনি বাধ্য হবেন এখনি তাকে গ্রেপ্তার করতে। আর এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার হলে তাকে আদালতে চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণ করা যাবে না। আমি তাকে আর একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে চাই। তার কন্‌ভিকশান হবার মতো আর একটি প্রমাণ আমি হাতে পেতে চাই··

—আমরা কি যৌথভাবে সে-কাজে এগিয়ে যেতে পারি না? পুলিসের সহায়তায় কি আপনি সেই নিশ্ছিদ্র প্রমাণটি সংগ্রহ করতে পারেন না?

—নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটাকে চিহ্নিত না করে!

—কেন?

—এখনি তা আমি বলেছি—সে ক্ষেত্রে আপনি তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবেন। আমার ফাঁদে পা দেবার দুর্যোগ থেকে সে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। আমি সুযোগ হারাব!

ঘোষাল-সাহেব আর এক চুমুক পান করলেন।

বাসু বললেন, এবার আমার প্রস্তাবটা শুনুন ঘোষাল-সাহেবে। রবিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে একটি শোকসভার আয়োজন করেছি। তিনজন মৃত ব্যক্তির প্রতি আমরা পর্যায়ক্রমে সম্মান জানাবো—প্রত্যেকটি মৃতব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে কেউ না কেউ আসবেন। পরস্পরকে সান্ত্বনা দেবেন। এটাই হচ্ছে বাহ্যিক আয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই পরিকল্পনার মূল নায়কও ঐ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং আমার আশা—সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে ঐ সভাতেই আমি তাকে চিহ্নিত করে ফেলব। 'কন্‌ভিকৃশন' হবার উপযুক্ত এভিডেন্স ঐ সভাতেই আমাদের হস্তগত হবে। আপনি আসুন,

রবি বোসকেও আমি ডেকেছি—ইন অ্যান্টিসিপেশন অব্ য়োর এনডোর্সমেন্ট—বলেছি, হ্যাণ্ডকাফ নিয়ে সে যেন সশস্ত্র আসে। কিছু প্লেন-ড্রেস সশস্ত্র পুলিসও থাকবে সভায়। যদি ঐ দিন সর্বসমক্ষে শয়তানটাকে আমি হাতে-নাতে ধরতে না পারি তাহলে—কথা দিচ্ছি—আমি আমার হাতের সব কয়খানা তাসই আপনার সামনে বিছিয়ে দেব। ডাজ দ্যাট স্যাটিসফাই য়্যু ?

—পার্ফেক্টলি ! আই উইশ য়্যু অল সাকসেস্ !

পনের

'ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল'-টাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। খাবার টেবিলটি অপসৃত। অন্যান্য ঘর থেকে চেয়ার এনে ঘরটা পৃথকভাবে সাজানো হয়েছে। একপ্রান্তে একটি টেবিলে পাশাপাশি তিনখানি মাল্যভূষিত আলোকচিত্র। রবি বসু বাদে নিমন্ত্রিতরা সবাই এসে পৌচেছেন। শোক-সভাটি পরিচালনা করছেন বাসু-সাহেবের গুরু—অতিবৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে।

উষা বাগচী উদ্‌বোধনী-সঙ্গীতটি গাইল দরদভরা গলায় :

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়,

কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।"

অনেকের চোখেই অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সুনীল দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। তার পিঠটা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। ময়ূরাক্ষীও বারে বারে চোখ মুছছিল। আর মৌ, মৃত ব্যক্তিত্রয়ের একজনকেও যে দেখেনি, সেও বারে বারে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

অনিতা তার মাস্টারমশায়ের অর্থাৎ ডক্টর চ্যাটার্জির কথা কিছু বলল।

ময়ূরাক্ষী মাথা নেড়ে অস্বীকার করায় 'কুশীলব'-সংস্থার তরফে অন্য একজন বনানীর অভিনয়-প্রতিভা ও অমায়িক স্বভাবের সম্বন্ধে কিছু শোনালেন। সুনীল আঢ্য কিছু বলার অবস্থায় নেই। তাই বাসু-সাহেব নিজেই স্বর্গত আঢ্য-মশায়ের বিষয়ে যেটুকু জানেন তা জানালেন—সৎ, সজ্জন, ধর্মভীরু মানুষটির পরিচয়।

প্রয়াত ব্যক্তিত্রয়ের আত্মার শান্তি কামনায় সকলে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করলেন। উষা আবার হারমনিয়ামটা টেনে নিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বাসু বলেন, না, না, সভার কাজ এখনো শেষ হয়নি। আরও একজনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। দৈহিক বিচারে তিনি জীবিত, মস্তিষ্কের পরিমণ্ডলে মৃত। আমি হেমাঙ্গিনী গর্লস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকটির কথা বলছি। আমরা সবাই জানি—তিনি এক বিকৃতমস্তিষ্ক হতভাগ্য। সজ্ঞানে

তিনি হত্যা করেননি কাউকে। দু-চার মাসের মধ্যেই অনিবার্যভাবে তাঁর ফাঁসি হবে। আত্মিকভাবে মৃত মাস্টারমশায়ের সম্বন্ধে আমি ডক্টর দাশরথী দেকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

বিকাশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠে, এ সভায় কি সেটা প্রাসঙ্গিক? শোকসভায় একজন ক্রিমিনাল··

এ. কে. রে বলে ওঠেন, না! তিনি ক্রিমিনাল না, বর্তমানে তিনি অভিযুক্ত মাত্র।

আই. জি. সি ঘোষাল-সাহেব সংক্ষেপে শুধু বলেন, কারেক্ট!

অনিতাও বলে ওঠে, আমি বরং শুনতেই চাই। দুদিন পরে তো তাঁকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলিয়েই দেওয়া হবে। আমরা জানতেও পারব না, কী-জন্য কী করে তিনি পর পর তিনজনকে··

দেখা গেল, সভায় অনেকেই শিবাজীপ্রতাপের পশ্চাৎপট বিষয়ে আগ্রহান্বিত।

অতঃপর ডক্টর দে তাঁর মাস্টারমশায়ের বিষয়ে অনেক কথা বলে গেলেন। যতটুকু তাঁর জানা। ইতিপূর্বে তিনি কতবার মানুষের গলা টিপে ধরেছিলেন, তাঁর কম্পাউণ্ডারির চাকরি, প্রুফরীডারী, হাইকোর্টের রেলিং ঘেঁষে টাইপ-রাইটিং করে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রচেষ্টা এবং 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' বিষয়ে তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থের কথা।

উনি থামতেই বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, শিবাজীপ্রতাপ চক্রবর্তীর গোটা ইতিহাসটাই আপনার শুনলেন। তিনি জীবনে ব্যর্থ, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে মানুষের গলা টিপে ধরতেন। তাঁর নামের ভিতরেও পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত একটা 'মেগালোম্যানিয়াক' ইঙ্গিত। তিন তিনটি হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁকে অকুস্থলের কাছাকাছি দেখা গেছে! কাকতালীয় ঘটনা তিন-তিনবার ঘটে না। তাছাড়া তাঁর ঘরে যে টাইপ-রাইটার আর সুকুমার রচনা-সমগ্র সেগুলিও তাঁর বিরুদ্ধে মোক্ষম প্রমাণ। কিন্তু একটা কথা—আমি যখন হাজতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন বেশ বুঝতে পারি 'পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল' এই নামটি তাঁর কাছে অপরিচিত। এক্ষেত্রে তিনি কেমন করে আমার নামে তিন-তিনখানি চিঠি···

ডক্টর ব্যানার্জি বাধা দিয়ে বলেন, সেটা ওঁর নিখুঁত অভিনয় হতে পারে। আপনি ধরতে পারেননি।

—দ্বিতীয় কথা: পুলিস আবিষ্কার করেছে—ঐ টাইপ-রাইটারটি রেমিংটন কোম্পানির ডালহৌসী-স্কোয়ারের দোকান থেকে দেড় বছর আগে নগদ মূল্যে কেউ খরিদ করেছে। সে সময় দেখছি শিবাজীপ্রতাপ কপর্দকহীন। তিনি কেমন করে ওটা ঐ সময় নগদ দামে কিনলেন?

ডক্টর ব্যানার্জিই পুনরায় প্রশ্ন করেন, এ বিষয়ে তিনি নিজে কী বলেন ? যন্ত্রটা কীসূত্রে তাঁর হেপাজতে এল, এ কথা কি তাঁর মনে পড়ে না ?

—পড়ে। তিনি বলেন—এটি ওঁকে উপহার দিয়েছিল ওঁর এক ছাত্র : হানিফ মহম্মদ।

বিকাশ বলে, তবে তো ল্যাটা চুকেই গেল। কীভাবে কপর্দকহীন মাস্টারমশাই···

—না, চুকলো না। তথ্য বলছে যে, হানিফ মহম্মদ দশ বছর আগে মারা গেছে।

সকলে নীরব। বাসু-সাহেব আবার শুরু করেন ! সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, কেউ নাম ভাঁড়িয়ে যন্ত্রটা ওঁকে উপহার দিয়েছিল। যাতে ঐ এভিডেন্সটা ওঁর হেপাজতে থাকে। বাড়ি সার্চ করার সময় যেন টাইপ-রাইটারটা পুলিসে উদ্ধার করে।

অ্যান্ড্রু ইয়ুলের মনীশ সেনরায় জানতে চায়, তিনটি চিঠিই যে ঐ টাইপ-রাইটারে ছাপা এটা কি প্রমাণিত হয়েছে ?

—হ্যাঁ, তিনটিই। কিন্তু আদ্যন্ত নয়। প্রতিটি চিঠির শেষের দিকে ঐ স্থান আর তারিখের অংশটুকু বাদে।

—তার মানে ?

—তার মানে, হানিফ মহম্মদের নাম করে যে ওঁকে যন্ত্রটা উপহার দেয় সে নিজেই চিঠিগুলি টাইপ করেছে, কিন্তু স্থান ও তারিখটা তখন বসায়নি। সে-লোকটা দেড় বছর আগে জানতো না—কোন্ তারিখে, কোথায় কোন খুনটা হবে !

অমল দত্ত বলে বসে, স্ট্রেঞ্জ !

—হ্যাঁ ! শুধু ঐটুকুই নয়। পণ্ডিচেরীর যে মহারাজ ওঁকে মাস-মাস মনি-অর্ডার করতেন, আর বইয়ের পার্সেল পাঠাতেন তিনিও অলীক। তাঁর পাত্তা পুলিসে পায়নি !

ডক্টর ব্যানার্জি বলেন, এ থেকে কী প্রমাণ হয় ?

—আমি জানি না। আপনারা বিবেচনা করে বলুন ?

—আপনি কি বলতে চাইছেন যে, শিবাজীপ্রতাপকে শিখণ্ডী খাড়া করে আর কোনও 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক্' এ কাজগুলো করছিল ?

বাসু বলেন, সেটা আপনাদের বিবেচ্য। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, তিনটি খুনের একটি যে শিবাজীপ্রতাপ করেননি এটুকু আমি জানতে পেরেছি।

এ. কে. রে বলেন, তোমার কাছে কোন্ এভিডেন্স আছে ?

—আছে স্যার ! অকাট্য প্রমাণ !

—কোন কেসটা ?

— বলছি স্যার। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব চাই—আপনাকেই আমি বিশেষভাবে প্রশ্ন করছি ডক্টর ব্যানার্জি। কারণ অপরাধ-বিজ্ঞানে আপনি পণ্ডিত। এমন কি হতে পারে না যে, নাম ও স্থানের কোয়েন্সিডেন্স-এর সুযোগ নিয়ে একজন খুনী তার পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলল—এই স্থির বিশ্বাসে যে, পুলিস কেসটাকে ঐ 'অ্যাল্‌ফাবেটিকাল সিরিজে'র একটা 'টার্ম' বলে ধরে নেবে ?

—এমনটা হতেই পারে। আপনি কোনও সূত্র পেয়েছেন ?

—পেয়েছি। যাঁকে সন্দেহ করেছি তিনি এ ঘরেই বর্তমানে উপস্থিত। আমার প্রস্তাব—এ ঘরের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে আমি এক-একটি প্রশ্ন করব। জবাবে তাঁরা নিছক সত্য কথা বলবেন, অথবা বলবেন, 'আমি জবাব দেব না।' তাহলেই সেই আততায়ীকে আমি চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করতে পারব। আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি ?

প্রায় বিশ সেকেণ্ড ঘর নিস্তব্ধ।

ডক্টর মিত্র বললেন, এতে আমাদের আপত্তি করার উপায় নেই। প্রতিবাদ যে করতে যাবে, সে নিজেই তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত হয়ে যাবে। আপনি শুরু করুন।

—আমি আপনাকেই প্রথম প্রশ্নটা করছি: আপনাকে আই.জি. ক্রিমিন্যাল-সাহেব কয়েকবার এক্সপার্ট হিসাবে কনফারেন্সে ডেকেছিলেন। সেজন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন। কিন্তু আপনার মনে হয়েছিল, এজন্য আপনার একটা 'প্রফেশ্নাল ফি' প্রাপ্য ছিল। — ইয়েস অর নো ?

ডক্টর মিত্র গম্ভীরস্বরে বললেন, আমি জবাব দেব না।

—নেক্সট সুনীল। তুমি একদিন লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলে, হঠাৎ বাবার সামনে পড়ে গিয়ে সিগারেট লুকিয়ে ফেল। বাবা দেখতে পাননি। —ইয়েস অর নো ?

সুনীল মাথা নিচু করে বললে, ইয়েস।

—থার্ড। মিস্টার অমল দত্ত। আপনি এজাহারে বলেছিলেন—বনানী যে ট্রেনে আসছিল তার আগের লোকালে আপনি বর্ধমান আসেন। অথচ বর্ধমানের একজন রিক্‌শাওয়ালা—যে আপনাকে চেনে, যাকে আপনি চেনেন না—বলছে যে, ঐ শেষ লোকালেই আপনি এসেছিলেন। রিকশাওয়ালাটা কি মিথ্যা কথা বলেছে ?

অমল দত্তের মুখটা সাদা হয়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, ইয়ে···মানে, এক কথায় এর জবাব হয় না। আমি বুঝিয়ে বলছি, শুনুন।

গর্জে ওঠেন বাসু-সাহেব: কৈফিয়ৎ দেবার অবকাশ নেই। —ইয়েস অর নো ?

অমল দাঁতে দাঁত দিয়ে বললে, আমি জবাব দেব না।

—ফোর্থ! মনীশবাবু! বনানীর বাক্সে কিছু প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। তার একটা সিরিজ টাইপ-রাইটারে ছাপা। আমার বিশ্বাস সেই চিঠিগুলি অ্যান্ড্রু ইয়ুল কোম্পানির কোন টাইপ-রাইটারে ছাপা। পুলিস-তদন্ত হলে এ সত্য প্র তিষ্ঠিত হবে। —ইয়েস আর নো?

মনীশ জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ইয়েস··· বাট্···

—নো 'বাট্' প্লীজ। পঞ্চম সাক্ষী ময়ূরাক্ষী। তুমি 'বাট্-ফাট' বলবে না। 'হ্যাঁ, না,' অথবা 'বলব না'-র মধ্যে তোমার জবাব সীমাবদ্ধ করবে। প্রশ্নটা এই —সুজাতা ফিরে এসে আমাকে বলেছিল যে, অমল দত্ত তোমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিল এবং তুমি তা প্রত্যাখ্যান কর—

—ইয়েস!

বাসু হেসে বলেল, প্রশ্নটা আগে আমাকে শেষ করতে দাও। ওটা তো ফ্যাক্ট। প্রতিষ্ঠিত সত্য। আমার প্রশ্নটা এই: তুমি ওর কাছে আর্থিক সাহায্য নাওনি এই কারণে যে, অমল তোমার দিদিকেই ভালোবাসত, এ কথা জেনেও যে, বনানী তাকে ভালোবাসত না, অথচ তুমি অমল দত্তকে ভালবাসতে এবং ভালোবাস!

ময়ূরাক্ষী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। যেন সর্বসমক্ষে বাসু-সাহেব তার ব্লাউসটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তার ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে থাকে। বলে, এসব···আপনি কী বলছেন?

—'ইয়েস, নো' অথবা 'বলব না' প্লীজ!

দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ময়ূরাক্ষী। তিনটে জবাবের একটাও জোগালো না তার মুখে।

সুজাতা নিঃশব্দে তার বাহুমূলটা ধরে বললে—বাথরুমটা ঐ দিকে।

হাত ধরে সে সভাস্থল থেকে ময়ূরাক্ষীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরে আল্‌পিন-পতন নিঃস্তব্ধতা।

—সিক্সথ্—অনিতা! তোমাকে যে প্রশ্নটা করছি তা এই: যদিও বিশ বছরের বয়সের ফারাক. এবং যদিও তুমি মিসেস্ চক্রবর্তীকে নিজের দিদির মত ভালোবাস, তবু মিসেস্ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর যদি ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি তোমাকে বিবাহ-প্রস্তাব দিতেন তাহলে তুমি সম্মত হতে! —ইয়েস অর নো?

অনিতাও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। যেন ময়ূরাক্ষীর পর এবার তার বস্ত্রহরণ পালা শুরু হল! তারও ঠোঁটদুটি নড়ে উঠল—বাক্যস্ফূর্তি হল না।

ঠিক তখনই কক্ষের ও-প্রান্ত থেকে এ. কে. রে বলে ওঠেন, অবজেক্‌শান

সাস্‌টেইণ্ড ! ইর্‌রেলিভেন্ট অ্যাণ্ড আর্গুমেন্টেটিভ ! কী হলে কী হত, তা সাক্ষী বলতে বাধ্য নয়, এমন কি 'আমি বলব না'—তাও নয়। তুমি বসে পড় অনিতা।

কাঁপতে কাঁপতে অনিতা বসে পড়ে।

—সেভেন্থ ! মিস্টার নিবি মজুমদার ! তোমাকে দীর্ঘদিন পূর্বে ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি তাঁর উইলটা সেফ্-কাস্টডিতে রাখতে দিয়েছিলেন। তাতে স্ত্রী, শ্যালক, অনিতা এবং অন্যান্যদের জন্য যথাযোগ্য লিগাসীর ব্যবস্থা করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একটি ট্রাস্ট বোর্ডকে দিয়ে গিয়েছিলেন—কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থরচনার দায়িত্ব দিয়ে। —ইয়েস্ অর নো ?

নিবি মজুমদার উঠে দাঁড়ালো। থ্রি-পীস স্যুট পরা একটি সুদর্শন যুবক। তার বয়স যে চল্লিশের কোঠায় তা বোঝা যায় না। ঘরের প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম পি. কে. বাসু ! তাঁর দৃষ্টি অন্যত্র !

নিবি হেসে বললে, ইয়েস ! ওঁর উইল আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

বাসু বললেন, অষ্টম সাক্ষীকে প্রশ্ন করার আগে আমি একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। ধরুন আমি যদি বলি, 'এখানে একটা আলপিন রয়েছে' অমনি আপনাদের দৃষ্টি যাবে মেঝের দিকে। মনে হবে কারো পায়ে না ফোটে, তারপর সোফা বা সেটিগুলোর দিকে তাকাবেন। তারপর টেবিলের উপর দৃষ্টি বুলিয়েও যখন আলপিনটা নজরে পড়বে না, তখন হয়তো বলবেন, 'কই ?' টেবিলের উপর পিন-কুশানে গাঁথা আমার সেই বিশেষ আলপিনটা দেখেও নজর করবেন না। এটা 'হিউম্যান-সাইকলজি'। আমরা কি এখানে ঐ জাতের ভুল করছি ? মনে করুন, একজন লোক দীঘার ধীরেন্দ্র ধরকে কোন কারণে খুন করতে চায়। কিন্তু সে জানে—পুলিস এসেই খোঁজ করবে ধীরেনবাবুর মৃত্যুতে কে সবচেয়ে লাভবান হল ? কে সম্ভাব্য খুনী হতে পারে ? এই জন্যে সে 'ধীরেন ধর-নামক' আল্‌পিনটাকে পিন্ কুশানে গেঁথে ফেলতে চাইল। সে যদি পর পর চারটি খুন করে—প্রথমে আলমবাজার, আলিপুর বা আগরতলার অসীম আচার্য, অনিমা আগারওয়াল ইত্যাদি নামের যে-কোন একজনকে, এবং তারপর বাটানগর, ব্যারাকপুর, বেহালার 'বি' নাম-উপাধীর কাউকে, এবং তারপর 'সি'-য়ের ঘাট পার হয়ে দীঘার ধীরেনবাবুকে খুন করে ? আর ঐ সঙ্গে সে যদি হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াকের ছদ্মবেশে পি. কে. বাসুকে ক্রমাগত পত্রাঘাত করতে থাকে তাহলে…

বাধা দিয়ে ডক্টর ব্যানার্জি বলে ওঠেন, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে 'পি. কে. বাসু'কে কেন ? সে তো সরাসরি ঘোষাল-সাহেবকেই চ্যালেঞ্জ থ্রো করবে। 'পি. কে. বাসু' বিখ্যাত ডিফেন্স কাউন্সেল—অপরাধী ধরে বেড়ানো তাঁর পেশা নয় ?

—তার হেতুটা যদি এই হয় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠিকানায় ভুল-জোনাল

নম্বর দিয়ে কোন একটি বিশেষ চিঠি ডেলিভারি হতে দেরি করাতে চায়? 'আই. জি. ক্রিমিনাল, কলকাতা' লেখা খাম পরদিনই এগারো-র এ ল'ডন স্ট্রীটের ঠিকানায় পেঁাছে যাবার সম্ভাবনা—জোনাল নাম্বারে অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও!

সকলেই একমনে চিন্তা করছেন—এটা একটা নতুন ধরনের যুক্তি।

বাসু বলেন, সে-ক্ষেত্রে ঐ আততায়ীকে এ. বি. সি. নামের বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে খুঁজে উপযুক্ত লোকের নাম এবং কে কখন—কোথায় ভালনারেব্‌ল্‌ সে খবরগুলো জানতে হবে। এটা তার পক্ষেই সম্ভব যাকে চাকরির প্রয়োজনে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে হয়। যেমন ধরুন একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। যার এলাকা, বর্ধমান, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর।

এবার বিকাশ হেসে ওঠে। বলে, আপনার যুক্তিটা যেন আর নৈর্ব্যক্তিক থাকতে চাইছে না বাসু-সাহেব! সূচীমুখ হতে চাইছে যেন? তাই নয়?

—ইয়েস! যেমন কথার-কথা হিসেবে ধরুন আপনার চাকরি। আপনাকে ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। আপনার পক্ষে আরও একটা সুবিধা আছে। আপনি ক্রমাগত ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেন। এমনকি সাইকিয়াট্রিস্টদের সঙ্গেও। ফলে 'অস্মার' রোগে ভুগছে—অর্থাৎ মাঝে-মাঝে যার স্মৃতি হারিয়ে যায় এমন রুগীর নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা সহজ। কারণ শেষ পর্যন্ত একটা 'ফল গাঈ', মানে 'রাঙা-মূলো' তো পুলিসের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। যে লোকটা আপনার বদলে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলবে! তার নাম যদি 'শিবাজীপ্রতাপ রাজ চক্রবর্তী' হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। স্বতই মনে হবে, পৈত্রিক সূত্রে সে মনে করে যে, সে নিজে একজন মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি! লোকটার যদি পূর্ব-ইতিহাসে বারে-বারে মানুষের গলা টিপে ধরার তথ্যটা থাকে তাহলে আরও ভালো। ধরুন আপনি ঘটনাচক্রে তার সম্পূর্ণ ইতিহাসটা জেনে ফেললেন—তাহলে কিছু ফিনিশিং টাচ দেওয়া দরকার। লোকটা শিশু সাহিত্য পড়তে ভালবাসে, ফলে সুকুমার গ্রন্থাবলী থেকে কেটে নিয়ে আর একটা এভিডেন্সও যোগ করা যেতে পারে। লোকটা অঙ্কের মাস্টার? তাহলে একপিঠে অঙ্ককষা-কাগজে চিঠিগুলো টাইপ করলে ...

বিকাশ অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, বাসু-সাহেব! আপনার বিশ্লেষণটি প্রাঞ্জল! প্রাণ জল হয়ে গেল সকলের! তা আমি সে-ক্ষেত্রে তিনটির ভিতর কোন্‌ খুনটা করব বলে দেড়-দু-বছর ধরে এতবড় পরিকল্পনাটা ফেঁদেছি?

—সেটা তো আপনিই আমাদের বলবেন বিকাশবাবু! কারণ আপনিই আমার অষ্টম সাক্ষী। আপনাকে আমার প্রশ্ন: ফিল্‌ম্‌-প্রডিউসার-এর ভেক ধরে আপনি কি বনানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেননি? নির্জন ফার্স্ট'ক্লাস কামরায় আপনি

ওকে গলা টিপে মেরে রাত বারোটা পাঁচে চন্দননগরে ট্রেন থেকে নেমে যাননি? —ইয়েস্ অর নো? নাকি 'বলব না?'

—আজ্ঞে না মহাশয়! আমি বলব: বনানী বনার্জিকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি!

—তার মানে: নো?

—আজ্ঞে না, তার মানে 'অ্যান এম্ফাটিক্ নো'!

—থ্যাঙ্কু!

বাসু-সাহেব থামলেন। ঘরের প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি এখন বিকাশের দিকে। সে নড়ে চড়ে বসল। বাসু-সাহেব বলেন, আমার নবম সাক্ষী ঊষা বাগচী। যার গান আপনারা শুনলেন। ঊষা, তোমাকে আমার প্রশ্ন: তুমি সুজাতাকে বলেছিলে—বনানীর অনেক বয়-ফ্রেণ্ডকে চিনতে। তুমি কি কখনো ঐ বিকাশ মুখুজ্জে-মশাইকে দেখেছ বনানীর সঙ্গে?

ঊষা বললে, ওঁর নাম বিকাশ মুখার্জী কি না তা আমি জানি না। কিন্তু সেদিনই তো ফটো দেখে বলেছিলাম—ঐ ভদ্রলোক একজন ফিল্ম প্রডিউসার। বনানীকে ফিল্মে নামার সুযোগ দিতে চাইছিলেন।

বিকাশ রুখে ওঠে, ফটো দেখে? কোন ফটো? কার ফটো?

বাসু তাঁর পকেট থেকে একটি ফটো বার করে দেখান: এইখানা। তোমারই! এই ফটোটা তোমাকে লুকিয়ে তুলতে হবে বলে সেদিন কম্পাস-টেলিফটো-লেন্স ইত্যাদি নিয়ে আমি চন্দননগর গিয়ে একটা হচ্পচ্ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম।

বিকাশ দৃঢ়স্বরে বলে, রঙ আইডেন্টিফিকেশন! এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না! আমি কেন তাকে খুন করব? কী স্বার্থ আমার যে, বনানীকে খুন কবব বলে দেড়-বছর ধরে…

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, কিন্তু বনানী যদি পিন্-কুশানের একটা ছোট্ট পিন্ হয়?

—তার মানে? তাহলে কে আমার মেন টার্গেট? ধরনীধর অব দীঘা?

—না! ডক্টর চন্দ্রচূড় চ্যাটার্জি অব চন্দননগর!

—জামাইবাবু! আপনি বদ্ধ উন্মাদ! যাঁর সম্পত্তির আমি একমাত্র ওয়ারিশ?

—তা যে তুমি নও সে-কথা তো আমরা সবাই জেনেছি বিকাশবাবু! এটাই ডক্টর চ্যাটার্জির জীবনের সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি—মন্ত্রগুপ্তি! সমস্ত সম্পত্তিটা যে তিনি উইল করে একটা ট্রাস্ট-বোর্ডকে দিয়ে গেলেন সেটা তোমাকে না জানানো! তাহলে তাঁকে এভাবে বেঘোরে মরতে হত না!

বিকাশ রুখে ওঠে, মিস্টার বাসু! আপনার যুক্তির আর পারম্পর্য থাকছে না কিন্তু! মক্কেলের মতো আপনিও এবার পাগ্‌লামি শুরু করেছেন! হয় আমি জানতাম ঐ উইলের কথা, অথবা জানতাম না। যদি সেটা আমার জানা থাকত তাহলে এই বীভৎস হত্যার কোনও মোটিভ থাকে না! আর যদি সেটা আমার না-জানা থাকত তাহলেও কোনও মোটিভ থাকে না, যেহেতু আমার বিশ্বাস অনুযায়ী—আমিই তাঁর ওয়ারিশ!

পিছন থেকে কে যেন বলে ওঠেন, কারেক্ট!

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, না! তৃতীয় একটি বিকল্পও যে রয়ে গেল⋯

—তৃতীয় বিকল্প? আমার জানা এবং না-জানার মাঝামাঝি?—জানতে চায় বিকাশ।

—হ্যাঁ তাই! তুমি জানতে যে, ঐ রিসার্চের ব্যাপারে চন্দ্রচূড় আর অনিতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছিলেন, জানতে যে, তোমার দিদির প্রয়াণের পর চন্দ্রচূড়ের সংসারের দায়িত্ব বর্তাতো অনিতাদেবীর উপর! তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতেন। ক্রমে তাঁদের সন্তানাদি হত। ডক্টর চ্যাটার্জির প্রথমপক্ষের শ্যালকের তখন মঞ্চ থেকে নিঃশব্দে প্রস্থান অনিবার্য হয়ে পড়তো! রে-সাহেব বাধা দেওয়ায় অনিতা যে প্রশ্নটার জবাব দিল না সেই জবাবটা অনেকদিন আগেই তুমি জানতে পেরেছিলে, বিকাশবাবু! তাই নয়?

বিকাশ জ্বলন্ত একজোড়া চোখ মেলে বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন বাসু-সাহেব—হত্যা যখন সংঘটিত হয় তখন আমি ঘটনাস্থল থেকে অনেক-অনেক দূরে। শেয়ালদহ-র কাছাকাছি সুইট-হোমে!

—আহ্! দ্যাটস্ য়োর ডিফেন্স! বজ্রবাঁধুনি অ্যালেবাঈ! তাই নয়? বিকাশবাবু! তুমি দু-বছর ধরে এতসব কিছু করলে অথচ ঐ সামান্য ব্যাপারটার কথা ভুলে গেলে? বেসিনের কলটার দিকে নজর গেল না তোমার?

—মানে?

—হোটেলে চেক-ইন করে রুদ্ধদ্বারকক্ষে তুমি মেক-আপ নিলে, যাতে পথে-ঘাটে বা চন্দননগরে কেউ হঠাৎ দেখলে চিনতে না পারে। তারপর রাত দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলে হাওড়া-স্টেশন। রাত এগারোটা সাতের লোকাল ধরে পৌঁছালে চন্দননগর। তুমি জানতে তোমার ভগ্নিপতি ঠিক কয়টার সময় মর্নিংওয়ার্কে বার হন, কতদূর যান এবং কোন্ বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম করেন। জানতে যে, খবরের কাগজটা তিনি দেখেননি, কারণ আগেই সেটা সরিয়ে ফেলেছিলে তুমি! প্রত্যাশিতভাবে ডুপ্লিকেট-চাবি দিয়ে গেট খুলে তিনি যে ওখানে ভোররাত্রে উপস্থিত থাকবেন এটা তোমার জানা ছিল। তাই কাজ

হাঁসিল করে ভোর পাঁচটা সাতান্নর লোকাল ধরে কলকাতায় ফিরে আসাটাও কোনও অসুবিধাজনক হয়নি। তাই নয়? নাকি ছয়টা এগারোর লোকালটা ধরতে হয়েছিল?

বিকাশ উঠে দাঁড়ায়। অনিতার হাতটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে বলে, চলে এস অনিতা! এইসব পাগলের বক্‌বকানি শুনতে হবে জানলে আমি এ শোকসভায় আদৌ আসতাম না।

অনিতা জোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, না! আমাকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে দাও বিকাশদা। বাসু-সাহেব, আপনি বলুন, এসব আন্দাজ আপনি করছেন কী সূত্রে?

বাসু বললেন, আন্দাজ নয় অনিতা, ফ্যাক্ট! ঐ যে একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছিল তোমার বিকাশদা! ক্রিমিনোলজি বলে—'পার্ফেক্ট-ক্রাইম বলে কিছু হতে পারে না।' বিকাশবাবু সব কিছু ঠিক ঠিক করল, কিন্তু হোটেল ছেড়ে যাবার সময় বেসিনের কলটা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেল। সে সময় কলে জল আসছিল না! জল আসতে শুরু করে রাত দুটোয়। শুধু ঐ ঘর নয়, করিডরটাও জলে থৈ থৈ! নাইট-ওয়াচম্যান বাধ্য হয়ে ম্যানেজারকে ডেকে তোলে। ডাকাডাকি করে বোর্ডারের সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে কলটা বন্ধ করা হয়। সে-রাত্রে বিকাশবাবু যে ঐ ঘরে ছিল না তার তিনটি সাক্ষী আছে! ম্যানেজার মনোহরবাবু, দারোয়ান রঘুবীর আর হেটেলবয় মদনা!

বিকাশ যেন পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত। হঠাৎ সম্বিত পেয়ে সে অনিতাকেই বলে ওঠে, তুমি না যাও তো এইসব আষাঢ়ে গল্প শুনতে থাক। আমি চললাম।

বাধা দিলেন আই. জি. ক্রাইম, জাস্ট এ মিনিট বিকাশবাবু! আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। যেখানে ইচ্ছে যাবার স্বাধীনতা আপনার এই মুহূর্তে আছে। কিন্তু আমার একটি পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গেলে আপনার সেই স্বাধীনতাটুকু আর থাকবে না। বলুন: সে-রাত্রে কি আপনি ঐ হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন?

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথাটা নিচু হয়ে যায় তার। কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, না স্যার! রাতটা আমি প্রস্টিটুট-কোয়ার্টার্সে কাটিয়েছি!

ঘরে পুনরায় নিস্তব্ধতা ফিরে আসে।

বাসুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠেন, সে সম্ভাবনার কথাও আমি ভেবেছি। ব্যাচিলার মানুষ! এমনটা তো হতেই পারে। সেজন্য আমি বিকল্প আর একটি প্রমাণ নিয়ে এসেছি। একজোড়া ফিঙ্গার-প্রিন্ট। ডক্টর ব্যানার্জি, আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এক্সপার্ট! অনুগ্রহ করে দেখুন তো, এই দুটি টিপছাপ কি একই ব্যক্তির?

দুখানি পোস্টকার্ড-সাইজ ফটোগ্রাফ তিনি বাড়িয়ে ধরেন ডক্টর ব্যানার্জির দিকে। তারপর এদিকে ফিরে বললেন, উনি ততক্ষণ পরীক্ষা করুন, আমি ইতিমধ্যে আপনাদের শোনাই—কীভাবে ঐ ফিঙ্গার প্রিন্ট দুটি সংগ্রহ করেছি। একটি পাওয়া গেছে শিবাজীপ্রতাপের আলমারিতে রাখা বইয়ের বাণ্ডিল থেকে। যে প্যাকেটে সুকুমার রায়ের বইটি ছিল, সেই না-খোলা প্যাকেটের উপর। প্যাকেটটা পণ্ডিচেরী থেকে পোস্টাল পার্সেলে এসেছে। যে পিয়ন বিলি করেছে, যে-সব পোস্টাল কর্মচারী হ্যাণ্ডল্ করেছে তাদের কারও আঙুলের ছাপ নয়, কারণ কালিটা হচ্ছে সেই কালি যাতে ঠিকানাটা লেখা। অর্থাৎ যে লোকটা শিবাজীপ্রতাপকে পার্সেলে বইটা পাঠিয়েছিল।

বাসু-সাহেব থামলেন।

ডক্টর ব্যানার্জি সেই অবকাশে বলেন, পয়েন্টস্ অব সিমিলারিটি ষোলো, না, সতের·· না, না আরও নজরে পডছে···

—আপনি দেখতে থাকুন ডক্টর ব্যানার্জি·

—না, না আর দেখার দরকার নেই। দুটি আঙুলের ছাপ একই ব্যক্তির।

বোধকরি কথাটা কানে গেল না বাসু-সাহেবের। তিনি একই ভঙ্গিতে বলে চলেন, আর দ্বিতীয়খানি আমি সংগ্রহ করেছি নিতান্ত ঘটনাচক্রে। চন্দননগরে। যেহেতু ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, 1935, অ্যামেণ্ডেড ইন্ 1955, ধারা নং 153 (c)-তে বলা হয়েছে যে, লাখ টাকার উপর যার মূল্যমান তেমন দলিলে সইয়ের সঙ্গে টিপছাপও দিতে হয়···

—নেভার হার্ড অব্ ইট ! ইণ্ডিয়ান স্ট্যাম্প অ্যাক্টের কত ধারা বললে যেন ? জানতে চাইলেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে।

বাসু হাসলেন, আপনাকে ধাপ্পা দিচ্ছি না ; কিন্তু ঐ ধারাটা আউড়ে সন্দেহভাজন একটি ব্যক্তিকে সেদিন ধাপ্পা দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। না হলে তার নিখুঁত ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা আমার পক্ষে···

কথাটা শেষ হল না। হঠাৎ বিকাশ লাফ দিয়ে ঘরের ও-প্রান্তে সরে গেল।

ঘরসুদ্ধ সকলের দৃষ্টি গেল তার দিকে।

বিকাশের হাতে একটি উদ্যত রিভলবার !

প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে, ছয়টা চেম্বারে ছয়টা বুলেট ! আই কংগ্র্যাচুলেট য়ু মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল ! দুঃখ এটুকুই যে, ফাঁসির দড়িটা আমার গলায় পরানো গেল না ; আর কি অপরিসীম দুঃখ ! আমার সঙ্গে তোমার খেলাও শেষ হয়ে গেল। ছয়-নম্বর বুলেটটা আমার। পঞ্চমটা তোমার। বাকি চারজন কে কে আমাদের সঙ্গে যাবে তুমিই নির্বাচন করে দাও বাসু-সাহেব ?

প্রত্যেকটি মানুষ যে-যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঘরে সূচীপতন নিস্তব্ধতা।

পরিস্থিতি যে একমুহূর্তে এভাবে বদলে যেতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

বাসু-সাহেব দু-হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। নির্বাক। নিস্পন্দ। ভয় কতটা পেয়েছেন বোঝা গেল না। অসীম আত্মসংযম তাঁর। কিন্তু কথা যখন বললেন তখন তাঁর গলাটাও কেঁপে গেল। বললেন, আমিই তোমার একমাত্র রাইভাল বিকাশ। বাকি কজন নিরীহ প্রাণীকে…

—সে কী! সে কী! তুমিই না প্রমাণ করেছ আমি 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক'। ডোণ্ট মুভ! আই ওয়ার্ন য়ু!

শেষ সাবধানবাণীটা ঘোষাল-সাহেবকে। তিনি তিলমাত্র নড়েছিলেন।

বিকাশ আরও এক পা পিছিয়ে গেল। যাতে এক লাফে কেউ তার নাগাল না পেতে পারে। সেখান থেকে বলল, না, বাসু-সাহেব! তোমার জন্য পঞ্চম বুলেটটা জমিয়ে রাখলাম। প্রথম বুলেটটা তোমার ঐ পঙ্গু স্ত্রীকে উপহার দিই বরং…

কিন্তু ট্রিগার টানবার অবকাশ সে পেল না। চকিতে ক্ষিপ্ত শার্দুল-শাবকের মতো তার দিকে লাফ দিল সুনীল। ষোলো বছরের তারুণ্যে ভরপুর কিশোর। এক লাফে বিকাশের কাছে পৌঁছানো তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ দূরত্ব যথেষ্ট। বিকাশ বিদ্যুদ্‌গতিতে পাশে ফিরে সুনীলকে লক্ষ্য করে ফায়ার করল। আশ্চর্য! তবু শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে সুনীল উলটে পড়ল না। তার বজ্রমুষ্টির আঘাতটা গিয়ে লাগল বিকাশের নাকে। নাকটা থেঁৎলে গেল। দরদর ধারে ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকাশ ভূপতিত হয়নি। টাল সামলে নিয়ে সে পর পর তিনটি ফায়ার করল সুনীলকে লক্ষ্য করে। পয়েণ্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে।

চার-চারবার ট্রিগার টানা সত্ত্বেও ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা গেলনা একবারও।

এতক্ষণে পিছনের পর্দা সরিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকেছে রবি বোস, তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেত। রবি বজ্রমুষ্টিতে ধরে ফেলেছে বিকাশের দুই বাহুমূল। পিছন থেকে। বিকাশ আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে ছাড়িয়ে বাসু-সাহেবকে লক্ষ্য করে আবার ফায়ার করতে চাইছে।

বাসুর হাতদুটি তখনো মাথার উপর তোলা। ঐ অবস্থাতেই বললেন, ওর চেম্বারে আরও দুটি বুলেট বাকি আছে, রবি। ওকে বাধা দিও না। ওকে আশ মিটিয়ে প্রতিশোধ নিতে দাও।

রবির হাত ছাড়িয়ে বিকাশ আবার ফায়ার করল। এবারও শব্দ হল না কিছু।

পিছনের পর্দা সরিয়ে ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছে মকবুল। সে বলে ওঠে,

ব্রেথাই হাঁকপাক করতিছ্যান কর্তা! নাই! অ্যাড্ডাও গুলি নাই। ছয়টা বুলেটই আমার জেব্-এ। দু-দুবার পাকিট মারছি! পেত্যয় না হয়, অ্যাই ত্যাহেন!

তার প্রসারিত তালুতে ছয়টি তাজা বুলেট।

বাসু এতক্ষণে উর্ধ্ববাহুমুদ্রায় ক্ষান্ত দিলেন। বললেন, আয়াম সরি ফর য় মিস্টার এ. বি. সি. ডি! ফাঁসির দড়ি ছাড়া তোমার আর বিকল্প রইল না কিছু!

সকলের দিকে ফিরে বলেন, রবি তার ডিউটি করুক। আপনারা বসুন। উষার সমাপ্তিসঙ্গীতটা বাকি আছে!

রাণীদেবী বলেন, শোকসভা। তাই সামান্য একটু মিষ্টিমুখের আয়োজন করেছি। বেশি কিছু নয়।

মনীশ বললে, এ-ছাড়া আমাদের মনে এখন যে প্রশ্নের পাহাড় জমে আছে! আপনি কী করে বুঝলেন?

রবি দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকাশের হাতে হ্যাণ্ডকাফ্ পরিয়ে বললে, বাঃ! আমি একাই ডিউটি করব? শুনতে পাব না?

—কেন পারবে না? ওর মাজার দড়িটা ঐ স্টীল আলমারির পায়ার সঙ্গে বেঁধে দাও! শুধু তুমি কেন, বিকাশবাবুরও ব্যাপারটা জেনে যাবার অধিকার আছে। আফটার অল, সেই তো নিয়োগ করেছিল আমাকে। পুলিসের উপর আস্থা না থাকায়।

কৌশিক জানতে চায়, ঠিক কোন্ মুহূর্তটিতে আপনি নিঃসন্দেহ হলেন?

—যে মুহূর্তটিতে সেই মেণ্টাল অ্যাসাইলামের ডাক্তারবাবু বললেন, চন্দন-নগরের মেডিক্যাল-রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ বিকাশ মুখার্জিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। বছর-দুই আগে একদিন তিনি বিকাশবাবুর সঙ্গে ঐ কেস্টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। শিবাজীপ্রতাপের গোটা কেস হিস্ট্রি—হানিফ মহম্মদের গলা টিপে ধরা থেকে সব কিছু।

সুজাতা বলে, কিন্তু আপনি সুইট-হোমের ঐ জলপ্লাবনের কথাটা কখন শুনলেন?

—শুনিনি তো! কিন্তু এটুকু জানতাম যে, মনোহর ঐ ঘরটা বিকাশবাবুকে সেরাত্রে ভাড়া দিতে চায়নি—কলে জল নেই বলে! অর্থাৎ বিকাশ জানত, কলে জল আসছিল না। ঘটনাটা সে রাত্রে ঘটেনি কিন্তু আমার বর্ণনা শুনে বিকাশের ধারণায় ওটা ঘটেছিল! সুইট-হোমের তিন-তিনটি প্রত্যক্ষদর্শীকে রুখতে সে প্রস্ কোয়ার্টার্সে যাওয়ার আষাঢ়ে গল্পটা ফেঁদে ফেল্ল। একবারও মনে হল না—প্রস্ কোয়ার্টার্সে রাত কাটাতে হলে হোটেলে আশ্রয় খোঁজা তার পক্ষে অযৌক্তিক!

—আর ফিঙ্গার প্রিন্ট? পুলিসের 'সীল' করা প্যাকেটটাও তো আপনি দেখেননি।

—না, আমি দেখিনি। কিন্তু বিকাশও জানে না যে, আমি দেখিনি। ইন ফ্যাক্ট—দুটো ফিঙ্গারপ্রিন্টই মিসেস্ চ্যাটার্জির সেই লিস্ট থেকে ফটো নেওয়া। ওটা ছিল আমার শেষ অস্ত্র! ততক্ষণে বিকাশবাবু মরিয়া হয়ে উঠেছে। পাঁচ-পা পিছিয়ে গেছে। তোমরা লক্ষ্য করনি, কিন্তু তখন ওর ডান-হাত ছিল পকেটে। বেচারি তো জানে না, ইতিমধ্যে মকবুল্ দুবার তার পকেটে মেরেছে! একবার বুলেটগুলো বার করে নিতে, একবার ফাঁকা অস্ত্রটা ওর পকেটে ঢুকিয়ে দিতে!

এবার প্রশ্ন করে রবি, আপনি কি করে আন্দাজ করলেন যে, শোকসভায় ও রিভলভার নিয়ে আস্‌বে?

—চন্দননগরে ইচ্ছাকৃতভাবেই ওর সঙ্গে আমার একবার ধাক্কা লাগে। ওর ধারণা অনিচ্ছাকৃতভাবে। আমি অনুভব করেছিলাম—তার ডান পকেটে সব সময়েই একটি রিভলভার থাকে। তাই এই সমাজসেবীটির সাহায্য নিয়েছিলাম। মকবুল্ নাকি শহর-কলকাতার চাম্পিয়ান—'ইয়ে'।

মকবুল ঘোষাল-সাহেবের দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বলে, আর লজ্জা দিয়েন না ছার!

সুনীল জানতে চায়, আর আমার সিগ্রেট খাওয়ার কথা?

—স্রেফ আন্দাজ! ও বয়সে আমার জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আন্দাজটা ভ্রান্ত হলে তোমার জবাব হত—'নো'। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হত না কিছু। কিন্তু সুনীল, তুমি ওর হাতে উদ্যত রিভালভার দেখেও কী ভাবে অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লে?

সুনীল লজ্জা পেল। বললে, বাবার সেই উবুড় হয়ে পড়ে থাকা চেহারাটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, স্যার! নিজের মৃত্যুর কথাটা তখন আর আমার খেয়াল ছিল না। মনে হল, মরার আগে ওর নাকটা অন্তত থেঁৎলে দিয়ে যাব আমি!

ঘোষাল-সাহেব বলেন, কাজটা তোমার হঠকারিতা হয়েছিল সুনীল, যাহোক, রবি ওর নাম ঠিকানাটা আমাকে দিও তো।

অমল দত্ত বলে, আমার একটা প্রশ্ন আছে। মনু সেদিন আমার কাছে কেন টাকা নেয়নি—

—আহ্! অমলদা! কী পাগ্‌লামো করছ!—চাপাকণ্ঠে ময়ূরাক্ষী প্রতিবাদ করে।

বাসু বলেন, হ্যাঁ। ওসব অবান্তর আলোচনা না করাই ভালো। অনেকের

অনেক গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে। এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, কাউকে বে-ইজ্জত করা বা অপমান করার উদ্দেশ্য আমার এক তিলও ছিল না। আমি শুধু 'টেম্পো'-টা তুলতে চাইছিলাম। উত্তেজনা আর কনফেশনের টেম্পোটা। জাল গুটিয়ে তোলার আগে এমনভাবে একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। যাতে প্রকৃত অপরাধী ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ে : ডানে-বাঁয়ে ক্রমাগত সকলের গোপন-কথা ফাঁস হয়ে যেতে দেখে! না হলে বিকাশ আমার শেষ ধাপ্পাটা ধরে ফেলত। ঐ ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারটা। কিন্তু ততক্ষণে তার উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে গেছে। ওর বুদ্ধি আর কাজ করছে না। ও নিজেও ওর শেষ অস্ত্রটার উপর নির্ভর করতে শুরু করল। তাই বারে বারে পিছু হঠে যাচ্ছিল—সকলের নাগালের বাইরে। ডান হাতটা ওর অনেক আগেই পকেটে ঢুকেছে। কিন্তু এসব বিশ্লেষণ এখানেই বন্ধ থাক। আবার বলি, যদি কাউকে আঘাত দিয়ে থাকি অসৌজন্যমূলক প্রশ্ন করে, তবে আমি ক্ষমা চাইছি!

মূল কাহিনী শেষ হয়েছে। উপসংহারে বছর-দুয়েক পরেকার কয়েকটি তথ্য পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একনম্বর : শিবাজীপ্রতাপ এখন ঐ চিলে-কোঠার ঘরে থাকেন। ডক্টর পলাশ মিত্রের চিকিৎসায় তিনি দিন দিন সুস্থ হয়ে উঠছেন। অন্য কোন চাকরি করেন না। দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন। চন্দননগরের একটি ট্রাস্ট-বোর্ড তাঁকে নাকি রিসার্চ স্কলারশিপ দিয়েছেন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য : 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা।'

ঐ ট্রাস্ট-বোর্ডে যে মহিলা সেক্রেটারী মোটা মাহিনায় নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর নাম : অনিতা সেনরায়। শোনা যায়, তিনি ছিলেন ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চ-অ্যাসিস্টেন্ট। তখন উপাধী ছিল গাঙ্গুলী। জনৈক 'মুগ্ধভ্রমরের' কৃতিত্বে বর্তমান উপাধী—সেনরায়।

স্বর্গত ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী মিসেস্ রমলা চট্টোপাধ্যায়ের সধবা অবস্থায় দেহান্ত ঘটেছে।

সুনীল আঢ্য এখন তার বাবার দোকানে বসে। সেকেণ্ড ডিভিশনে সে ম্যাট্রিক পাশ করার পর পড়াশুনাটা আর চালায়নি।

গতবছর সাহসিকতার জন্য সে একটি পুলিস-মডেল পেয়েছে।

একটা দুঃখের খবর : ময়ূরাক্ষীর এবছর বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। অর্থাভাবে নয়। হেতুটা এই : পরীক্ষার সময় মিসেস্ ময়ূরাক্ষী দত্ত ছিলেন আসন্ন সন্তানসম্ভবা।

অ-আ-ক-খুনের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল